দাম : দশ টাকা

পশ্চিমবঙ্গে নাগরিকপঞ্জী নবীকরণের কাজ শুরু করা প্রয়োজন— পৃঃ ২১

স্বস্তিকা

পশ্চিমবঙ্গে এন আর সি-র তত্ত্বাবধানে জনগণনা দরকার— পৃঃ ১৯

৭০ বর্ষ, ২৪ সংখ্যা।। ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮।। ২২ মাঘ - ১৪২৪।। যুগাব্দ ৫১১৯।। website : www.eswastika.com

‘বাঙালি’ আবেগ তুলে নাগরিক পঞ্জীকরণে মমতার বিরোধিতা

NRC

NATIONAL REGISTER OF CITIZENS

কাদের স্বার্থে ?

সুপ্রিম কোর্টের চার বিচারপতির নজিরবিহীন সাংবাদিক সম্মেলন

গণতন্ত্রের পীঠস্থানে মৃদু ভূমিকম্প

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭০ বর্ষ ২৪ সংখ্যা, ২২ মাঘ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

৫ ফেব্রুয়ারি - ২০১৮, যুগাব্দ - ৫১১৯,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

সরকারি বিজ্ঞাপনের লোভে কলকাতার বাংলা কাগজের মালিকরা সবাই এখন মমতাপন্থী ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

খোলা চিঠি : অনেক লাশ চাই, লাশ। তবেই না গণতন্ত্র!
▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

গণতন্ত্রের পীঠস্থানে মৃদু ভূমিকম্প ▯ ধর্মানন্দ দেব ▯ ১২

সাক্ষাৎকার— কংগ্রেস দলেরও কংগ্রেসি সংস্কৃতি এবার ত্যাগ করা উচিত : নরেন্দ্র মোদী ▯ ১৫

পশ্চিমবঙ্গে এন. আর. সি.-র তত্ত্বাবধানে জনগণনা হওয়া দরকার ▯ ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস ▯ ১৯

পশ্চিমবঙ্গে নাগরিকপঞ্জী নবীকরণের কাজ অবিলম্বে শুরু করা প্রয়োজন ▯ মোহিত রায় ▯ ২১

ভারতের সংবিধান সকলের আস্থা এবং বিশ্বাসের প্রতীক
▯ রবিশঙ্কর প্রসাদ ▯ ২৭

ভিয়েতনামের 'চম্পা' সুপ্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল নিদর্শন ▯ ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ৩১

রূপদেহের রূপাই কালী ▯ দেবপ্রসাদ মজুমদার ▯ ৩৩

চাষবাসের বারোমাস্যা : মাঘী কৃষি
▯ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ▯ ৩৫

নিয়মিত বিভাগ

এই সময়, সমাবেশ সমাচার : ২৪-২৬ ▯ চিঠিপত্র : ২৯-৩০ ▯ অঙ্গনা : ৩৪ ▯ সুস্বাস্থ্য: ৩৭ ▯ অন্যরকম : ৩৮ ▯ খেলা : ৩৯ ▯ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ▯ স্বজনবিয়োগ : ৪২

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

ত্রিপুরার ভোটে বিজেপির সম্ভাবনা

ত্রিপুরার ভোটের দামামা বেজে গেছে। রাজনীতির ছোট বড়ো নেতা-কর্মী থেকে শুরু করে সাধারণ সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক থেকে শুরু করে ছাত্র— সকলেরই প্রশ্ন, ত্রিপুরায় কেমন ফল করবে বিজেপি? সরকার গঠন করতে পারবে কি? স্বস্তিকার আগমী সংখ্যায় থাকবে নির্বাচন-পূর্ববর্তী ত্রিপুরার রাজনৈতিক বিশ্লেষণ। চীনের আগ্রাসন থেকে সমগ্র উত্তরপূর্ব ভারতকে রক্ষা করার জন্য ত্রিপুরায় জাতীয়তাবাদী সরকারের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করবেন এই সময়ের বিশিষ্ট লেখকরা।

।। দাম একই থাকছে— দশ টাকা মাত্র।।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

Account Name : SWASTIKA

A/C. No. : 0314050014429

IFSC Code : UTBI0BIS158

Bank Name :

United Bank of India

Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

কাশ্মীরে পাথর নিক্ষেপ : সেনাপ্রধানের অভিমত

কাশ্মীর উপত্যকায় কোনও না কোনও ইস্যুকে কেন্দ্র করিয়া সেনা ও সুরক্ষা বাহিনীর বিরুদ্ধে পাথর নিক্ষেপ অব্যাহত। সম্প্রতি দক্ষিণ কাশ্মীরের সোপিয়ান জেলায় স্থানীয় একদল পাকপন্থী ও উগ্রবাদী সমর্থক পাথর ছুঁড়িলে সেনাদের গুলিতে দুইজন নিহত হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে ফোন করিয়া নিজের ক্ষোভ ব্যক্ত করিয়াছেন। একই সঙ্গে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ হইতে সেনাবাহিনীর জওয়ানদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট দাখিল করা হইয়াছে। কাশ্মীরের সাম্প্রতিক এইসব ঘটনা দেখিয়া সেনাপ্রধান বিপিন রাওয়াত ঠিকই বলিয়াছেন যে, সুরক্ষা বাহিনীর বিশেষাধিকার অধিনিয়ম অর্থাৎ আফস্পা প্রত্যাহার বিষয়ের পুনর্বিচারের প্রয়োজন নাই। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে, ইতিপূর্বে মণিপুরের শর্মিলা ইনম চানু আফস্পা প্রত্যাহারের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরিয়া অনশন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দাবি মানিয়া লওয়া হয় নাই। শেষ পর্যন্ত উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি অনশন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই ক্ষেত্রে তাই আরও ভালো হইবে যে, সেনাপ্রধানের এই বক্তব্যকে সুরক্ষা বাহিনীর প্রতিটি স্তরে পৌঁছাইয়া দেওয়া যাহাতে জম্মু-কাশ্মীর সরকার ও উগ্রবাদী সমর্থকদের মনে কোনও সংশয় না থাকে যে, পাথর বৃষ্টির মতো অরাজকতার বিরুদ্ধে সেনার পক্ষে কোনও নরম মনোভাব লওয়া হইবে। উপত্যকায় পাথর নিক্ষেপকারীরা শুধু সেনাদের কাজে বাধাই দিতেছে না, সেই সঙ্গে ক্ষতি করিবারও চেষ্টা করিতেছে। ইহা অপেক্ষা আর কী দুর্ভাগ্যের হইতে পারে যে, যখন পাথর বর্ষণকারীদের সতর্ক করা ও তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন, তখন মুফতি ও তাঁহার সঙ্গীরা এইসব ঘটনা লঘু করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিতেছেন। কিছুদিন বন্ধ থাকিবার পর নূতন করিয়া পাথর বর্ষণের ঘটনাকে যে লঘু করিয়া দেখা হইবে না, তাহা আবার স্পষ্ট করিয়া দিতে হইবে। অসহমত, অসন্তোষ বা আক্রোশ—যাহারই বশবর্তী হইয়া এই পাথর বর্ষণ হউক না কেন, তাহা কঠোরভাবে মোকাবিলা করা হইবে। 'জিরো টলারেন্স' নীতিকে সম্পূর্ণ ভাবে প্রয়োগ করা হইবে। পাথর-নিক্ষেপ এক ধরনের হীন মানসিকতা যাহা বর্বরোচিত কাজে প্ররোচিত করে। যাহারা মনে করে পাথর-বর্ষণ বিরোধিতার একটা প্রকাশ মাত্র, তাহাদের একবার ইহার মোকাবিলা করিয়া দেখা দরকার যে কত ধানে কত চাল। এই মানসিকতা সম্ভবত পাকপন্থী উগ্রবাদীদের প্রতি নরম মনোভাবের দুষ্পরিণাম। মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতির যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বোঝা উচিত সেনা ও সুরক্ষা বাহিনীরও সহ্যের একটা সীমা রহিয়াছে। উগ্রবাদী ও তাহাদের সমর্থক পাথর-নিক্ষেপকারীদের মদত দিয়া তাঁহার এবং জম্মু-কাশ্মীর সরকারের কোনও লাভ হইবে না। তিনি যদি মনে করিয়া থাকেন যে, সেনা ও সুরক্ষা বাহিনীর সংযম দেখানো উচিত, তবে তাঁহাকেও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সেনাদেরও কিছু অধিকার আছে। সেনাদের সঙ্গে মতবিরোধের পরিবর্তে তাঁহার দেখা দরকার সাম্প্রতিক সময়ে সেনাবাহিনী মানবিকতা রক্ষার ক্ষেত্রে কীরূপ উদাহরণযোগ্য সচেতনতার পরিচয় দিয়াছে। মানবিকতা রক্ষার নামে পাথর নিক্ষেপকারীদের সমর্থন কোনও ভাবেই স্বীকার করা যায় না।

সুভাষিতম্

বিদ্বত্বং চ নৃপত্বং চ নৈব তুল্যং কদাচন।

স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে।।

বিদ্বান ও রাজার মধ্যে কোনওরূপ তুলনা করা চলে না। রাজা কেবলমাত্র নিজ রাজ্যেই সম্মানিত হন কিন্তু বিদ্বান সর্বত্র পূজিত হন।

১৮ জন শিশু ও কিশোরকে জাতীয় সাহসিকতা পুরস্কার দিলেন প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দেশের ১৮ জন শিশু ও কিশোরকে গত ২৪ জানুয়ারি জাতীয় সাহসিকতা পুরস্কার দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদের মধ্যে তিনজন পেল মরণোত্তর পুরস্কার।

পুরস্কার বিজয়ীদের সঙ্গে আলাপচারিতাকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাদের সাহসিকতার কাজগুলি আজ লোকের মুখে মুখে। এমনকী সংবাদমাধ্যমও এই সমস্ত ঘটনা তুলে ধরেছে। সুতরাং, এই শিশু ও কিশোররা যে তাদের সমবয়সী অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। শুধু তাই নয়, অন্যান্য ছেলে-মেয়ের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের মানসিকতাকেও তা আরও উদ্দীপ্ত করে তুলবে।

শ্রী মোদী বলেন, পুরস্কার বিজয়ীদের অধিকাংশই উঠে এসেছে গ্রাম এবং নিতান্তই সাধারণ পরিবার থেকে। প্রতিদিনের জীবন সংগ্রামই সম্ভবত তাদের সাহায্য করেছে সঙ্কল্পের মানসিকতা গ্রহণে। প্রতিকূল পরিস্থিতির কীভাবে সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবিলা করা যায়, তা তাদের শিক্ষা দিয়েছে এই ধরনের পরিস্থিতি।

সকল পুরস্কার বিজয়ী, তাদের পিতা-মাতা এবং স্কুল শিক্ষকদের অভিনন্দিত করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি প্রশংসা করেছেন তাঁদেরও যাঁরা তাদের সাহসিকতার দৃষ্টান্তগুলিকে তুলে ধরছেন সকলের সামনে। আর এইভাবেই সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে এই শিশু ও কিশোরদের দিকে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, এই ধরনের স্বীকৃতি লাভের ঘটনা পুরস্কার বিজয়ীদের কাছে থেকে প্রত্যাশা বাড়িয়ে দিল আরও বেশি মাত্রায়। তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপ্রচেষ্টাগুলির জন্য শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুবিকাশ মন্ত্রী শ্রীমতী মানেকা গান্ধী।

ভারত হিন্দুরাষ্ট্র : মোহন ভাগবত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সম্প্রতি গুয়াহাটির খানাপাড়া ভেটেরিনারি কলেজ ময়দানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আয়োজনে এক বিরাট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ৫০ হাজার মানুষ। প্রধান বক্তা সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত এদিন বলেন ভারত পাকিস্তানকে শত্রুদেশ বলে মনে করে না। কিন্তু পাকিস্তান ভারতকে শত্রু মনে করে। তাঁর কথায়, 'মহেঞ্জোদরো এবং হরপ্পা এখন পাকিস্তানে। এই দুটি শহর ভারতের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের অঙ্গ কিন্তু পাকিস্তান তা স্বীকার করে না। পাকিস্তান সম্পূর্ণ একটি আলাদা দেশ। তাই তারা হিন্দুত্ব স্বীকার করে না।' বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের মানুষ বাংলায় কথা বলেন। তা সত্ত্বেও দেশটি আলাদা কেন? তার কারণ বাংলাদেশ হিন্দুত্বকে স্বীকার করে না।' তাঁর মতে একমাত্র হিন্দুত্বই 'নানা ভাষা, ধর্ম, জীবনযাপন পদ্ধতি এবং রীতিনীতির দেশ ভারতকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে।' তিনি আরও বলেন, 'হিন্দুত্বের সঙ্গে বৈচিত্র্যের কোনও বিরোধ নেই। কিন্তু বিভাজনের সঙ্গে আছে। ভারত বৈচিত্র্যে বিশ্বাসী। তাই ভারত হিন্দুরাষ্ট্র।' সম্মেলনের মুখ্য আয়োজক সঙ্ঘের উত্তর অসম প্রান্ত। এই জেলায় রয়েছে সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, নাগাল্যান্ড এবং মেঘালয়। সম্মেলনে অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল স্বয়ংসেবক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বাজেট অধিবেশনের উদ্বোধনী ভাষণে রাষ্ট্রপতি

‘আমার সরকারের লক্ষ্য তোষণ নয়, ক্ষমতায়ণ’

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সংসদের দুই কক্ষের সদস্যদের উপস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের ভাষণের মাধ্যমে শুরু হলো ২০১৮-র বাজেট অধিবেশন। রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে বিবিধ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের সাফল্য তুলে ধরেন। শৌচালয় নির্মাণ থেকে শুরু করে ছোটবড়ো কোনও বিষয়ই তাঁর পর্যবেক্ষণ থেকে বাদ পড়েনি।

ভাষণের শুরুতেই রাষ্ট্রপতি সাধারণতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য সকলকে ধন্যবাদ দেন। এরপরেই তিনি গত সাড়ে তিন বছরে মোদী সরকারের সাফল্য তুলে ধরেন। সরকারের পক্ষ থেকে তিনি বলেন, ‘তোষণ নয়, এই সরকারের লক্ষ্য ক্ষমতায়ণ।’ তিন তালাক আইনের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, ‘আমি আশা করব সংসদ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিলটি পাশ করে আইন প্রণয়ন করতে সাহায্য করবে। কারণ মুসলমান মহিলারা যাতে আত্মমর্যাদার সঙ্গে জীবনযাপন করতে পারেন সেটা দেখা সরকারের কর্তব্য। তার জন্য তিন তালাক আইন খুবই জরুরি।’

রাষ্ট্রপতি বলেন, দীনদয়াল অমৃত যোজনায় ৫২০০ রকমের জীবনদায়ী ওষুধ এবং অস্ত্রোপচারের উপকরণ ৬০ থেকে ৯০ শতাংশ ছাড়ে ১১১টি বিতরণ কেন্দ্রের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই জারি রয়েছে। গত এক বছরে সাড়ে তিন লক্ষ ভুয়ো সংস্থার লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে।

সাম্প্রতিককালে মিডিয়ার একাংশ এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির ইন্ধনে তৈরি হওয়া ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র সম্পর্কিত বিতর্ক প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি বলেন, ‘ব্যাঙ্কিং শিল্পকে আরও শক্তিশালী এবং স্বচ্ছ করার ব্যাপারে সরকার দায়বদ্ধ। সরকার চায় পাবলিক সেক্টর

ব্যাঙ্কগুলিকে ২ লক্ষ কোটি টাকা অনুদান দিয়ে রিক্যাপিটালাইজেশন করতে।’ তিনি আরও বলেন, জনধন যোজনায় এখনও পর্যন্ত গরিব এবং পিছিয়ে পড়া মানুষেরা ৩১ কোটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এই প্রকল্পে সেভিংস অ্যাকাউন্ট খোলার ক্ষেত্রে সব থেকে উপকৃত হয়েছেন মহিলারা। অ্যাকাউন্ট খোলার পরিমাণ ২৮ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৪০ শতাংশ।

প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনায় ১০ কোটি ঋণপ্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ঋণদানের পরিমাণ ৪ লক্ষ কোটি টাকা। বিবিধ স্বনিযুক্তি প্রকল্পে এই যোজনায় তিন কোটি মানুষ আছেন যারা প্রথম ঋণ নিলেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, ডিজিটাল লেনদেনের ক্ষেত্রে ভীমা অ্যাপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সম্প্রতি প্রকাশিত উমঙ্গ অ্যাপের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবন যাপনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ১০০টি বিষয়ে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী ফার্মাসিউটিক্যাল সেন্টারের মাধ্যমে ৮০০ ধরনের ওষুধ গরিব মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে সরকার। এই ধরনের সেন্টারের সংখ্যা সারা দেশে ৩০০০। সরকার গরিব এবং মধ্যবিত্তদের জন্য জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়ন করেছে। রাষ্ট্রপতি বলেন, ‘প্রতিটি মানুষের মাথার ওপর ছাদ থাকা উচিত। সেই সঙ্গে তাঁরা যাতে জল, বিদ্যুৎ এবং শৌচালয়ের সুবিধা পান সেই লক্ষ্যে আমার সরকার কাজ করছে। ২০২২ সালের মধ্যে এইসব সুবিধা প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে।’

সারা দেশে প্রায় আড়াই কোটি প্রতিবন্ধী মানুষ বাস করেন। তাদের জন্য সরকার দিব্যাঙ্গন রুল অ্যাক্ট ২০১৬ প্রণয়ন করেছে। প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি চাকরির ৪ শতাংশ ইতিমধ্যেই সংরক্ষণ করা হয়েছে। উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে এই সংরক্ষণ ৫ শতাংশ। রাষ্ট্রপতি বলেন, দেশের প্রতিটি গরিব মানুষ যাতে পেটভরে খেতে পারেন তার জন্য জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনের দিক্‌নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিটি রাজ্যকে কম দামে খাদ্যশস্য দেওয়া হচ্ছে। সমাজের প্রতিটি স্তরে উন্নয়নের ধারা পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী গ্রামসড়ক যোজনায় দেশের ৮২ শতাংশ গ্রামকে সড়কের মাধ্যমে সংযুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। ২০১৪ সালে এর পরিমাণ ছিল মাত্র ৫৬ শতাংশ। রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, ‘গরিব মানুষকে আরও শক্তিশালী করে তোলার জন্য আমার সরকার দেশের ৪০ কোটি মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছে। ইন্ডিয়া নেট প্রোজেক্টের আওতায় দেশের আড়াই কোটি গ্রামপঞ্চায়েতকে ব্রডব্যান্ডের সুবিধে প্রদান করা হয়েছে। সারা দেশে ২ লক্ষ ৭০ হাজার সার্ভিস সেন্টার তৈরি করা হয়েছে, যাদের মাধ্যমে বিবিধ ডিজিটাল পরিষেবা মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে।’

আগামী দিনে কেন্দ্রীয় সরকার আরও কিছু জনকল্যাণমুখী প্রকল্প রচনা করবে। সরকারের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি এই প্রসঙ্গে উপস্থিত সাংসদদের প্রতিশ্রুতি দেন এবং সকলকে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করেন।

সন্দেহ এন আই এ-র

প্যারিস হামলায় যোগ কেরলের আই এস জঙ্গির

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ২০১৫-র নভেম্বরে প্যারিসে সন্ত্রাসবাদী হামলার সঙ্গে জড়িত ছিল ধৃত আই এস জঙ্গি কেরলের বাসিন্দা সুবাহানি হাজা মইদেন। প্রাথমিক তদন্তের পর এমনই মনে করছেন গোয়েন্দারা। ২০১৬-র ৫ অক্টোবর এই জঙ্গিটিকে তামিলনাড়ুর কুদায়ানাল্লুর থেকে গ্রেপ্তার করে জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা এন আই এ। জেরায় জানা যায় তার বাড়ি কেরলের থোডুপুঝায়। ইরাকের দুই আই এস জঙ্গি আবদেল হামিদ আবাউদ ও সালাহ আবদেলস্লামের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। এই দুই জঙ্গি ২০১৫-র প্যারিস হামলার সঙ্গে যুক্ত ছিল। যে হামলায় ১২৯ জন নিরীহ মানুষ প্রাণ হারান। জিজ্ঞাসাবাদের পর গোয়েন্দাদের এও মনে হয়েছে যে সুবাহানি নিজেও প্যারিস হামলার

সুবাহানি হাজা মইদেন

পরিকল্পনায় যুক্ত ছিল।

ইরাকের আই এস ঘাঁটি মসুলে যে জঙ্গি প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজিত হচ্ছিল ২০১৫ সালে তাতেই তার সঙ্গে আবাউদ ও আবদেলস্লামের আলাপ। ছবি দেখে এই দু'জনকে শনাক্তও করে সে। তবে এই দুই দাগী জঙ্গির প্রকৃত নাম সে জানত না বলেই দাবি সুবাহানির। শুধুমাত্র তাদের ছদ্ম-পদবি 'আল ফ্রানসিজি'-টুকুই সে জানত বলে গোয়েন্দাদের বলেছে সুবাহানি। ২০১৫-এর এপ্রিলে 'উমরাহ' পালনের নাম করে দেশ ছেড়ে ইস্তানবুলে পৌঁছায় সে। গোয়েন্দারা জেনেছেন চেন্নাই বিমানবন্দর থেকে সে ওই তুরস্কের শহরে রওয়ানা দিয়েছিল। পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে আসা আরও একদল জঙ্গি-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সেও ইরাকের আই এস-নিয়ন্ত্রিত জঙ্গি প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নেয়।

জেরায় সুবাহানির দাবি, প্রশিক্ষণের পর মাসিক ১০০ মার্কিন ডলারের বিনিময়ে তার নিরাপত্তা-রক্ষীর একটি কাজও জোটে কয়েকমাসের জন্য। কিন্তু জঙ্গিদের নৃশংসতা ও যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে সে নাকি দেশে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথমে আই এস জঙ্গিরা তাকে বন্দি করলেও পরে ছেড়ে দেয় ও ২০১৫-র ২২ সেপ্টেম্বর সে ভারতে ফিরে আসে। গোয়েন্দাদের বক্তব্য সাধারণত এসব ক্ষেত্রে 'বিশ্বাসঘাতক'দের মেরে ফেলাই জঙ্গিদের রেওয়াজ। কিন্তু সুবাহানির ক্ষেত্রে তা না হওয়ায় সে গোয়েন্দাদের বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করছে কিনা তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তাই প্যারিস হামলা ঘটার আগে সে কিছু জানত না বললেও তা বিশ্বাস করতে গোয়েন্দারা নারাজ। কেরলের কান্নুরের কানাকামালা ও কোঝিকরের কুটায়াদিতে আই এস যে জঙ্গি মডিউলের প্রশিক্ষণ দিত, যারা ওমর-আল-হিন্দ ছদ্মনামের আড়ালে নাশকতামূলক কাজকর্ম চালাত, তাদের যে ছয় সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছিল, তার মধ্যে অন্যতম ছিল সুবাহানি।

এন আই এ-র থেকে খবর পেয়ে সুবাহানিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইছে ফরাসি গোয়েন্দারা। এর জন্য কেরল হাইকোর্টে আবেদনও করতে চলেছে তারা। সূত্রের খবর আদালতের অনুমতি মিললেই ত্রিশূরের ভিউরের সেন্ট্রাল জেলে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে প্যারিস পুলিশ।

ডোকলাম প্রশ্নে ফের সুর নরম চীনের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতের চাপের কাছে ফের নতিস্বীকার চীনের। সুর নরম করে চীনা বিদেশমন্ত্রক জানিয়ে দিল ভারত-চীনের সীমান্ত সমস্যা 'শান্তিপূর্ণ উপায়ে' সমাধানের দিকে দু'দেশের এগানো উচিত। সম্প্রতি চীনে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত গৌতম বাম্বাওয়ালে চীনের সরকারি মুখপত্র গ্লোবাল টাইমসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন ৩৪৮৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ভারত-চীন সীমান্তের পরিস্থিতির বদল হয়নি। তারই পরিপ্রেক্ষিতে চীনা বিদেশ মন্ত্রকের মুখপত্র হু চুইং গত ২৯ জানুয়ারি জানান বর্তমান প্রক্রিয়াতেই সীমান্ত পৃথকীকরণ সম্ভব। সেই সূত্রেই ভারত-চীন দু'পক্ষেরই নরম মনোভাব নিয়ে চলা দরকার বলে তিনি জানান। ডোকলাম মুখোমুখি ভারত-চীনের সেনা মোতায়েন নিয়ে চীন পরিস্থিতি উত্তপ্ত করার চেষ্টা বহুবার করেছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক চাপ ও ভারতের সমর-শক্তির কাছে পিছু হঠার পর থেকেই তাদের গলায় এরকম শান্তির সুর আগেও শোনা গিয়েছে।

এমনকী সাধারণতন্ত্র দিবসের দিনও স্থানীয় স্তরে দু'দেশের সেনার মধ্যে এনিয়ে প্রাথমিক কথাবার্তা হয়। এসব ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে আলোচনায় বসার ব্যাপারে চীন এতদিন অনাগ্রহই দেখিয়েছিল। এখন পরিস্থিতি অন্যদিকে বাঁক নিয়েছে বুঝেই চীনের এই বোধদয় বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত। এরই পাশাপাশি চীন-ভারত শত্রু নয়, বরং দু'দেশ বন্ধু, এই বার্তায় শোনা গিয়েছে চীনের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে। ভারতকে সহযোগী বন্ধু হিসেবে তারা পেতে আগ্রহী বলে হু জানিয়েছে। যদিও শুধু শুকনো কথায় যে চিড়ে ভিজবে না, তা স্পষ্ট করে দিয়েছে ভারতও। বিশেষ করে সন্ত্রাস প্রশ্নে চীনের পাক-প্রেম ও ভারতকে যেন তেন প্রকারেণ রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্য পদে আটকানোর চেষ্টা যে ভারত ভালোভাবে নেবে না তাও বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সংসদে অর্থনৈতিক সমীক্ষার রিপোর্ট পেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দেশের বাণিজ্য নীতিতে যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সূচিত হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে— বৈদেশিক বাণিজ্য নীতির অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনা এবং ২০১৭'র ডিসেম্বর বিশ্ব শ্রম সংগঠন (ডব্ল্যুটিও)-এর বহুপক্ষীয় আলোচনা ও মতৈক্য। গত ২৯ জানুয়ারি সংসদে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির পেশ করা ২০১৭-১৮'র অর্থনৈতিক সমীক্ষায় একথার উল্লেখ করা হয়েছে।

২০১৭'র ৫ ডিসেম্বর বৈদেশিক বাণিজ্য নীতির অন্তর্বর্তীকালীন যে পর্যালোচনা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে ভারতের বাণিজ্য ক্ষেত্রকে সহায়তাদানের জন্য কতকগুলি অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

এছাড়াও, ওই বছরেরই ১৫ ডিসেম্বর চর্ম ও পাদুকা শিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্যাকেজ অনুমোদন করে কেন্দ্রীয় সরকার। এর ফলে ওই ক্ষেত্রটি থেকে রপ্তানির কাজকর্মও বিশেষভাবে উৎসাহিত হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিশ্ব শ্রম সংগঠন (ডব্ল্যুটিও)-এর মন্ত্রীপর্যায়ের একাদশ সম্মেলন শেষ হয় কোনও রকম ঘোষণা ছাড়াই। সম্মেলন চলাকালীন ডব্ল্যুটিও-র মূল নীতিগুলির প্রশ্নে ভারতের অবস্থান ছিল খুবই দৃঢ়। বহুপাক্ষিকবাদ, নিয়ম-নীতি ভিত্তিক সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে বিবাদ-বিসংবাদের নিষ্পত্তি, উন্নয়নের মূল কেন্দ্রবিন্দুকে গুরুত্বদান— এই সমস্ত বিষয়ে ভারত বরাবরই ছিল ডব্ল্যুটিও-র পাশে।

ভারতের বিদেশি মুদ্রার মজুত ভাণ্ডার ২০১৭-র ডিসেম্বরের শেষে পৌঁছেছে ৪০৯.৪ বিলিয়ন ডলারে। ২০১৬-র ডিসেম্বর থেকে ২০১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিদেশি মুদ্রার মজুত বৃদ্ধি পেয়েছে ১৪.১ শতাংশ হারে। বর্তমান বছরের ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত বিদেশি মুদ্রার মজুত ভাণ্ডার বৃদ্ধি পেয়ে উন্নীত হয়েছে ৪১৩.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। এক কথায়, ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি এবং বিদেশি মুদ্রার মজুত ভাণ্ডার ঊর্ধ্বমুখী।

উবাচ

"তোষণ নয়, ক্ষমতায়নে দায়বদ্ধ সরকার। সংখ্যালঘুদের শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জোর চেষ্টা চালাচ্ছে কেন্দ্র।"

সংসদের যৌথ অধিবেশনের প্রথম ভাষণে

রামনাথ কোবিন্দ
ভারতের রাষ্ট্রপতি

"শীতকালীন অধিবেশনে তিন তালাক বিল পাশ করা সম্ভব হয়নি। মুসলমান মহিলাদের অধিকারকে সুরক্ষা প্রদানের জন্য এই আইন পাশ হওয়া প্রয়োজন।"

তিন তালাক বিল পাশে বিরোধীদের ভূমিকা প্রসঙ্গে

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

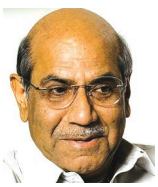

"ভারতীয় ভূখণ্ডের মধ্য দিয়ে চীন যে পাকিস্তানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিশেষ অর্থনৈতিক করিডোর তৈরি করছে তা নিয়ে নয়াদিল্লির আগে ভাগে সতর্কতা গ্রহণ করা উচিত।"

অধিকৃত কাশ্মীরের মধ্যে দিয়ে চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর তৈরি প্রসঙ্গে

শ্যাম সরণ
ভারতের প্রাক্তন বিদেশ সচিব

"তালিবান ও জঙ্গি পরিকাঠামোকে সাহায্যকারীদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত অভিযানে নামা উচিত সব দেশের।"

সম্প্রতি কাবুলে বিধ্বংসী বিস্ফোরণের পর তালিবান দমন প্রসঙ্গে

ডোনাল্ড ট্রাম্প
আমেরিকার রাষ্ট্রপতি

"হিন্দুত্বের ধারণার সঙ্গে বৈচিত্র্যের কোনও বিরোধিতা নেই। কিন্তু বিভাজনের সঙ্গে আছে। ভারত বৈচিত্র্যে বিশ্বাসী। তাই ভারত হিন্দুরাষ্ট্র।"

ভারতীয়ত্ব এবং হিন্দুত্বের ধারণা প্রসঙ্গে

মোহন ভাগবত
রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক

সরকারি বিজ্ঞাপনের লোভে কলকাতার বাংলা কাগজের মালিকরা সবাই এখন মমতাপন্থী

বাংলা সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকতার ২০০ বছর পূর্তি হয়েছে গত ডিসেম্বর মাসে। কিন্তু রাজ্যের কোথাও বড় মাপের উৎসব অনুষ্ঠানের খবর কানে আসেনি। সেটাই স্বাভাবিক ঘটনা। কারণ, বাংলা সাংবাদিকতা এবং বাঙালি সাংবাদিকদের জীবন ও জীবিকা আজ বিপন্ন। কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর পরিচালকরা কাগজের আশি শতাংশ সিনিয়ার জার্নালিস্টদের সংস্থা থেকে বের করে দিয়েছেন। একই পথে হাঁটছেন কলকাতার অন্যান্য বাংলা কাগজের মালিকরা। দেখা যাচ্ছে, পঞ্চাশ বছর বয়স হলে মালিকরা মনে করছেন অভিজ্ঞ সাংবাদিকদের অভিজ্ঞতার আর দাম নেই। তাছাড়া অল্পবয়সি নবিশ সাংবাদিকরা সামান্য বেতনে দিনে দশ-বারো ঘণ্টা কাজ করতে প্রস্তুত। এদের জন্য সাংবাদিকদের কেন্দ্রীয় ওয়েজ বোর্ডের সুপারিশ মানতে হবে না। কাগজে ঢোকার সময় তরুণ সাংবাদিকদের এখন মুচলেকা লিখে দিতে হয় যে, তাঁরা মালিকদের ইচ্ছামত চাকরির শর্ত মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন। চাকরির স্থায়িত্ব এবং বেতন সবই মালিকের ইচ্ছাধীন। কলকাতার সমস্ত বাংলা সংবাদপত্রে এখনও কেন্দ্রীয় ওয়েজ বোর্ডের সুপারিশ মানা হয় না। সংবাদপত্রের আয়-ব্যয়ের হিসাব কষে সাংবাদিক ও অন্যান্য কর্মীদের বেতনক্রম স্থির করেছে কেন্দ্রীয় বেতন বোর্ড। তাই বেতন বোর্ডের সুপারিশ না মানার যুক্তি নেই। তবু মানা হয় না। কারণটা আর্থিক নয়। সমস্যাটা ইগোর লড়াই। কলকাতার বাংলা সংবাদপত্রের ১০০ শতাংশ মালিকানা পারিবারিক। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন। কাগজের মালিকরা বুক বাজিয়ে বলেন, 'আমার কাগজ। আমার ইচ্ছামত বেতন দেব। কাজ পছন্দ না হলে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেব।' কেন্দ্রীয় সরকার বেতন স্থির করার কে? বাংলা কাগজের মালিকরা ভুলে যাচ্ছেন যে, সংবাদপত্রের জন্য বেতন বোর্ড গঠিত হয়েছে সংসদে আইন পাশ করিয়ে। দেশের সব ভাষায় প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্রের জন্য। কোথাও সমস্যা হচ্ছে না। শুধু কলকাতার বাংলা খবরের কাগজের মালিকদেরই সমস্যা হচ্ছে। এর মধ্যে বেশি সমস্যা হচ্ছে আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর। কেন? বহুজাতিক ভোগ্যপণ্য প্রস্তুতকারক সংস্থারা যেভাবে বিপণন করে সেভাবেই খবরের কাগজের অফিস চালাচ্ছেন বাংলা কাগজের পরিচালকরা। তাঁদের কাছে বিড়ি বাঁধার কারখানা চালানো এবং কাগজের অফিস চালানোটা একই। মূল লক্ষ্য, মুনাফা ঘরে তোলা। সমাজের কল্যাণ নয়। পাঠকদের কাছে

গূঢ় পুরুষের

কলম

দায়বদ্ধতা মালিকরা ভুলে গেছেন। ঢালাও রাজ্য সরকারের বিজ্ঞাপন পেতে কলকাতার বাংলা খবরের কাগজের মালিকরা সকলেই এখন মমতাপন্থী হয়েছেন। বাম আমলে বাংলা কাগজ 'আজকাল' ছিল বামপন্থী। কট্টর বামপন্থী। এখন কট্টর মমতাপন্থী কাগজ। কথাটা বললাম বোঝাতে যে, বাংলা কাগজের মালিকরা আদতে বিড়ির কারবারি। আগে তাঁরা লাল সুতোর বিড়ি বাঁধতেন। এখন সবুজ সুতোর বিড়ি বাঁধছেন। সেই পঞ্চাশের দশক থেকেই বাংলা খবরের কাগজের মালিকদের নির্দেশে রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট খবর ছাপা হচ্ছে। আজও সেই ধারা চলছে। সংবাদপত্রের মূলধন তার বিশ্বাসযোগ্যতা। তার প্রচার সংখ্যা বা মুদ্রণ পারিপাট্য নয়। এই কথাটা বোঝাবে কে? আনন্দবাজার পত্রিকায় পাতাজোড়া বিজ্ঞাপন দিয়ে দাবি করা হয় যে পাঠক সংখ্যা এবং মুদ্রণ পারিপাট্যে তারা এক নম্বরে। বাংলা কাগজ 'এই সময়' দাবি করে যে তারা রাজনৈতিক খবরে সবার থেকে এগিয়ে। এদের দাবি শুনলে বলতে হয়, 'আস্তে কন্ কর্তা, ঘুড়ায় শুনলে হাসবা...।'

আদত কথাটা তাঁরা বলেন না যে, এখন সবাই মমতাপন্থী। তা না হলে সরকারি বিজ্ঞাপন বন্ধ হবে। তাই মিথ্যে অথবা তৃণমূলের পছন্দের খবর ছাপতে হবে। তাই প্রতিদিন মমতার ছবি ছাপতে হবে। আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠী (এবিপি) চলতি মাসে জনমত সমীক্ষা করে নাকি দেখেছেন যে, মমতা দিদি প্রধানমন্ত্রী পদের প্রার্থী হিসাবে নরেন্দ্র মোদীর থেকে জনপ্রিয়তায় অনেকটাই এগিয়ে গেছেন। আমি আপনাদের আগাম বলে দিতে পারি যে এবিপি গোষ্ঠীর পরের সমীক্ষা রিপোর্টে লেখা হবে প্রধানমন্ত্রীর কুরশিতে বসুন মমতা, দেশবাসী চাইছেন। একটা দলপতি শেয়াল কেয়া হুয়া, কেয়া হুয়া, বলে ডাকলেই বাকিরা 'মমতা দিদি রাজা হুয়া' ডাক ছাড়বে। এইটাই কলকাতার বাংলা কাগজের ট্রেন্ড। এ বি পি হচ্ছে ট্রেন্ড সেটার। নবপ্রজন্মের বাংলা দৈনিকের সাংবাদিকরা কর্তাদের নেক নজরে পড়ার জন্য মিথ্যা সংবাদ লেখেন এমন কথা তাঁরা অস্বীকার করতে পারেন কি? সম্প্রতি কলকাতায় স্পিলবার্গের ছবি 'দ্য পোস্ট' দেখানো হয়। ছবিতে দেখানো হয় আমেরিকার জনপ্রিয় দৈনিক, 'দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট'-এর মালকিন এবং তাঁর কাগজের প্রধান সম্পাদক হাতে পান পেন্টাগন পেপারস্। যেখানে ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকার পিছু হঠার স্পষ্ট স্বীকারোক্তি আছে। এই খবর ছাপলে প্রেসিডেন্ট তাঁর বিশেষ ক্ষমতাবলে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেবেন। গ্রেপ্তার হবেন কাগজের মালকিন এবং তাঁর সম্পাদক। সব জেনে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাগজের মালিক, সম্পাদক এবং সাংবাদিকরা পেন্টাগন পেপারস্ ছাপেন। মামলা আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চে গড়ায়। শীর্ষ আদালত রায় দেয় যে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হচ্ছে শাসিতের স্বার্থরক্ষার জন্য। শাসকের স্বার্থরক্ষার জন্য নয়। কলকাতার বাংলা খবরের কাগজের পরিচালক-মালিকেরা পাঠকের স্বার্থরক্ষায় কাজ না করে রাজ্যের শাসকদের স্বার্থরক্ষায় কাজ করছেন। বাংলা সাংবাদিকতার ২০০ বছর পূর্তিতে এটাই মুনাফাখোর মালিকদের উপহার। এই উপহার আমরা প্রত্যাখ্যান করছি। দাবি জানাচ্ছি, পক্ষপাতদুষ্ট মতলবি খবর পরিবেশন বন্ধ করুন।

অনেক লাশ চাই, লাশ। তবেই না গনতন্ত্র

মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়,

না, দিদি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে বা তৃণমূলনেত্রীকে চিঠি লিখছি না। এই চিঠি এক লড়াকু নেত্রীকে। একজন অনুভবী কবি, লেখিকা, শিল্পীকে। যিনি মায়ের কষ্ট বোঝেন, বুঝবেন।

এই চিঠি আমার নিজের কথাও নয়। এক মায়ের কথা। বলতে পারেন তাঁর হয়েই আমি লিখছি। এই তো সেদিনের কথা দিদি। ১৮ জানুয়ারি। আপনি নিশ্চয়ই ভুলে যাননি যে বাসন্তীতে দুই পক্ষের গোলাগুলির মাঝে এক শিশু প্রাণ দিয়েছে। না, এটা কাশ্মীর নয়, আমাদের সোনার বাংলা। আর গোলাগুলি চালায়নি কোনও জঙ্গি বা জওয়ান। তৃণমূল কংগ্রেসেরই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে লড়াই। না, তৃণমূলনেত্রী হিসেবে আপনার কাছে এই নালিশ নয়। ওই গুলির লড়াইয়ে ওই শিশুর বাবা, কাকারাও জড়িত। তাদেরই গুলিতে নয় বছরের রিয়াজুল মরে গেছে। সোজা কথায় মরে গেছে। গুলিটা বুক দিয়ে ঢুকে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। বাংলার ছেলে রিয়াজুল মোল্লা। বাসন্তীর চড়বিদ্যা পঞ্চায়েতের হেতালখালির ছাত্র রিয়াজুল হয়তো অনেক কিছু হতে পারত। এই বাংলার নাম উজ্জ্বল করতে পারত। কিছু না হোক ওর মাকে আরও অনেক অনেক দিন মাতৃত্বের আনন্দ দিতে পারত।

রাজনীতির কূটকাচালি বোঝার মতো ক্ষমতা যখন এই ছাত্রটির হয়নি, তখন রাজনৈতিক দলগুলির লড়াইয়েই প্রাণ হারাল রিয়াজুল। দিদি, আমি বার বার ভাবছি ও কোন গোষ্ঠীর ছিল?

এ তো 'এলিট' সমাজের আবেশ দাশগুপ্ত নয়। মদ খেয়ে বন্ধুদের সঙ্গে 'বার্থডে সেলিব্রেশন' করতে গিয়ে তো আর 'রহস্যজনক' মৃত্যু হয়নি তার। সুতরাং, কোন প্রত্যন্ত গ্রামের এক গরিব পরিবারের এক ছাত্রের রাজনৈতিক লড়াইয়ের মাঝে বেঘোরে প্রাণ হারানো নিয়ে অত মাথা না ঘামালেও চলে।

কিন্তু ওর মা মারুফার কান্না যেন থেমেও থামছে না। খড়ের চাল দেওয়া এক চিলতে ঘরের সামনে এক টুকরো উঠোনে বসে বুক চাপড়াচ্ছেন তিনি। মারুফা সেদিন গুলিগোলার মাঝে নিজেই ছেলেকে স্কুল থেকে আনতে গিয়েছিলেন। স্কুল থেকে বাড়ি, ১০০ মিটারেরও কম পথের মাঝে একপক্ষের ছোঁড়া গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে রিয়াজুল। কলকাতা থেকে দালাল মারফত আসা জামাকাপড় সেলাই করে সর্বসাকুল্যে হাজার চার-পাঁচেক টাকা রোজগার মারুফা ও তাঁর স্বামী রফিকুল মোল্লার। এক মুঠো ভাত-ডাল হলেই যাঁদের সংসার চলে যায়, সেখানে দুই সন্তানের একজনকে হারিয়ে ফেললেন মারুফা। স্বপ্ন ছিল, এই ছেলে বড় হয়ে ভাত-ডালের সংসারে নুনের জোগান দেবে। মাঝে মাঝে মাছ।

''আমরা কোনও গণ্ডগোলে যাই না। বাড়িতে থাকি। কাপড় সেলাই করি। আর আমার বাচ্চাই গুলি লেগে মারা গেল। ওরা তো কেড়ে নিচ্ছিল। বলছিল আমাদের লাশ''— বলেছেন মারুফা। 'ওরা' কারা? বাসন্তীর এই অঞ্চলে 'ওরা-আমরা'র কোনও জায়গায়ই নেই। সেখানে তৃণমূলেরই একাধিপত্য। গ্রামের লোকেরাই অভিযোগ করছেন, তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্বেই এই গুলির লড়াই।

গ্রামের বাসিন্দাদের অভিযোগ, জয়ন্ত নস্করের লোক টপু প্রধানের নেতৃত্বেই এই গুলি চালানো হয়েছে। জয়ন্ত নস্কর হলেন গোসাবার তৃণমূল বিধায়ক। আর টপু প্রধান হলেন গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান সুচিত্রা মাহাতোর ছেলে। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক হয়েও তিনিই বকলমে পঞ্চায়েত চালান।

এ তো গেল একটি গ্রামের কথা। এরকম হাজার হাজার গ্রামে একই রকম অবস্থা। উনিশ-বিশ এদিক ওদিক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনি উন্নয়নের কথা বলছেন। কাজ করছেন সেই লক্ষ্যে। কিন্তু আপনার গুণধর ভাইয়েরা যা করছেন তাতে বিপদ শুধু আপনার দলের নয়, বিপদ এই রাজ্যেরও।

অনেক প্রশ্নের উত্তর নেই। এই শিশুরাও কি জেনে বা না জেনে জড়িয়ে পড়ছে বন্দুক বন্দুক খেলায়? সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন। যুদ্ধও হবে ত্রিস্তরে। বাসন্তীর পথের ধারে গ্রামে গ্রামে বড়দের গুলি ছোটদের তাক করবে না তো!

কোল শূন্য হওয়া মায়ের কাছ থেকে
নিথর দেহটাও কেড়ে নিতে চাইবে
না তো 'লাশ'
রাজনীতির কারবারিরা?

—সুন্দর মৌলিক

গণতন্ত্রের পীঠস্থানে মৃদু ভূমিকম্প

ধর্মানন্দ দেব

গণতন্ত্রের মূল তিনটি স্তম্ভ হচ্ছে যথাক্রমে আইনসভা, বিচারসভা এবং শাসনব্যবস্থা। আর বিচারসভার ক্ষমতার বুনিয়াদ হচ্ছে সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বিচার ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই সংবিধানের ৫০ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে—''রাষ্ট্র বিচার ব্যবস্থাকে প্রশাসনিক ব্যবস্থার থেকে আলাদা রাখবার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।'' এইকথার অর্থই হচ্ছে বিচার ব্যবস্থাকে থাকতে হবে স্বাধীন। আর এই স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা নিয়েই প্রশ্ন উত্থাপন করলেন গত ১২ জানুয়ারি দেশের সর্বোচ্চ আদালতের মুখ্যবিচারপতির পরবর্তী চার প্রবীণতম বিচারপতি। এঁরা হলেন জে চেলামেশ্বর, রঞ্জন গগৈ, জোসেফ কুরিয়েন এবং মদন লোকুর। মৃদু ভূমিকম্প হলে যেমন ঘরবাড়ি নাড়িয়ে রেখে দেয়, ঠিক তেমনি চার বিচারপতির একটি নজিরবিহীন সাংবাদিক সম্মেলন দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটিকে বলতে গেলে ভূমিকম্পের মতো নাড়িয়ে দিয়েছে। উত্থাপিত প্রশ্ন বা সমস্যা যতই গভীর হোক না কেন, বিচারপতিরা মুখ্যবিচারপতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করার জন্য দিল্লিতে নিজ সরকারি বাসভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করে 'জনতার আদালত'-এ অবতীর্ণ হতে পারেন কি না সেই প্রশ্ন আমার আপনার মতো অনেকের। বিচারবিভাগের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি কোনও হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতিকে ওই হাইকোর্টের মুখ্যবিচারপতি বলা হয়, যেমন গৌহাটি হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতিকে আমরা বলে থাকি—'Chief Justice of Gwahati High Court'. কিন্তু সুপ্রিমকোর্টের মুখ্য বিচারপতিকে আমরা বলে থাকি—'Chief Justice of India'। অর্থাৎ তিনি সমগ্র ভারতের মুখ্য বিচারপতি।

এটাও অনস্বীকার্য যে চার প্রবীণ বিচারকের উদ্বেগ বা ক্ষোভ সম্পূর্ণ অহেতুক নাও হতে পারে। ওই ঘটনাটি আকাশ থেকে পড়েনি। তাই সংকট অনেক সময় সংস্কারের পথপ্রদর্শক হয়। এই সংকটকালে বিচার ব্যবস্থার যদি কিছুটা সংস্কার হয় তবে ভালো। কিন্তু চার বিচারকের ক্ষোভ বা উদ্বেগ নিয়ে পর্যালোচনা করলে পাওয়া যায় তাঁরা নাকি মুখ্য বিচারপতির কাছে পত্র লিখেও কোনও পরিবর্তন বা সংস্কার পাননি। বিচারপতি চেলামেশ্বরের ভাষায়—'আদালতের প্রশাসনিক বিষয়টি জানাতে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তাকে জানানো হয়েছিল কোনও কিছুই ঠিকঠাক চলছে না। এর একটা বিহিত দরকার। কিন্তু দুর্ভাগ্য এটাই যে, আমাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।' তাই তাঁরা জনতার আদালতে উপস্থিত হয়েছেন। মুখ্য বিচারপতিকে লেখা সাত পাতার পত্র থেকে যদি আমরা নির্যাস বের করি, তাহলে দেখা যাবে---(১) সুপ্রিমকোর্টের বেশ কিছু বিচারবিভাগীয় নির্দেশ পুরো বিচার ব্যবস্থাকেই বিপন্ন করছে এবং বিভিন্ন হাইকোর্টের স্বাধীনতাও ক্ষুণ্ণ করেছে। (২) প্রধান বিচারপতির দপ্তরের প্রশাসনিক কাজকর্মও প্রভাবিত হচ্ছে। (৩) সাম্প্রতিক সময়ে ঐতিহ্যগত রীতি-নীতিগুলি ঠিকঠাক মান্য করা হচ্ছে না। দেশ এবং প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সুদূরপ্রসারী গুরুত্বের বহু মামলা প্রধান বিচারপতি রীতি বহির্ভূতভাবেই পছন্দের বেঞ্চে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। যদিও এর কোনও যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা নেই। (৪) আর পি লুথরা বনাম ভারত সরকারের মামলায় রায়ে ভুল হয়েছে এবং সেই ভুল সংশোধনের দায় প্রধান বিচারপতির, কারণ কলেজিয়ামের অধিকার পর্যালোচনা ফুল কোর্টের বিচার্য। সাংবিধানিক বেঞ্চ ছাড়া অন্য কোনও বেঞ্চে এনিয়ে পর্যালোচনার কোনও সুযোগ নেই।

ওই পত্রের নির্যাস থেকে বলতে বাধা নেই বিষয়গুলি তাঁদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। তাই বিচারবিভাগের নিজস্ব পরিসরেই সীমিত থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল। কারও বাড়িতে যদি কোনও অশান্তি হয়, তার জেরে নিশ্চয় রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঝগড়া করাটা উচিত নয়। সেটা বাড়ির মধ্যেই মেটানো আবশ্যক। কেন্দ্রীয় আইন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী পি. পি. চৌধুরি এ প্রসঙ্গে বলেন, 'বিচারবিভাগ স্বাধীন এবং সম্মাননীয় ক্ষেত্র। তারা নিজেরাই এই বিষয়টি মিটিয়ে ফেলবে।'' পরিবারের সদস্যদের যার যা রাগ দুঃখ রয়েছে, তা আলোচনা সাপেক্ষে বাড়ির মধ্যেই মিটিয়ে নেওয়া ভালো ছিল। কিন্তু তা না করে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে জনতার আদালতে ছেড়ে দেওয়া কতটুকু বৈধ তা নিয়ে যথেষ্ট আইনি প্রশ্ন ও বিতর্ক রয়েছে। এনিয়ে সুপ্রিমকোর্টের নিয়ম কী বলছে। এভাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে কি জনতার আদালতে যেতে পারেন বিচারপতিরা? আমরা যদি দেখি ১৯৯৭ সালের ৭ মে সুপ্রিমকোর্টের গ্রহণ করা 'রিস্টেটমেন্ট অব ভ্যালুস অব জুডিশিয়াল লাইফ' অনুসারে বিচারপতিকে তাঁর বক্তব্য জানাতে হবে রায়দানের মাধ্যমে। সেই প্রচ্ছদের ৮ ও ৯ নম্বর পয়েন্টে স্পষ্ট বলা আছে এইরূপ—''8. A Judge shall not enter into public debate or express his views in public on political matters or on matters that are pending or are likely to arise for judicial determination.

9. A Judge is expected to let his judgments speak for themselves. He shall not give interviews to the media.''

উপরে উল্লেখ করা সাত পাতার নির্যাসের তিন ও চার নম্বর নিয়েই আজ সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। কেননা চার বিচারকের মূল সমস্যা রোস্টার নিয়েই। অর্থাৎ বিচারপতিদের মধ্যে মামলা বণ্টন নিয়ে। বিচারকরা অভিযোগ করে বলেছেন, এমন বহু মামলা, যার রায় বা পর্যবেক্ষণ দেশের সুদূর ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থেকে যাবে, সেখানেই প্রধান বিচারপতি অপেক্ষাকৃত জুনিয়র বিচারপতিদের নিয়ে বেঞ্চ গঠন করেছেন, যা কখনওই কাম্য নয়। এতে যোগ্যতার বিচার হচ্ছে না। বরং 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বাছাই' হচ্ছে। কিন্তু বর্তমান নিয়ম অনুসারে কোন মামলায় কোন কোন বিচারপতির বেঞ্চ গঠিত হবে, তা স্থির করা সম্পূর্ণ প্রধান বিচারপতির আওতাধীন। তিনিই এ ব্যাপারে শেষ কথা। অর্থাৎ তিনিই 'মাস্টার অব রোস্টার'।

১৯৯৭ সালের রাজস্থানে যোধপুরে এক আইনজীবীর দাখিল করা এক পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশনের রায় প্রদান করে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। ওই রায়ে মোট ১৩টি নির্যাস পাওয়া যায়। তার মধ্যে উপসংহারের দুই, তিন ও ছয় নম্বর নির্যাসে স্পষ্ট বলা হয়েছিল এইরূপ—''**(2).** That the Chief Justice is the master of the roster. He alone has the prerogative to constitute benches of the court and allocated cases to the benches so constituted. **(3)** That the puisne Judges can only do that work as is allotted to them by the Chief Justice or under his directions. **(6)** That the puisne Judges cannot ''pack and choose'' any case pending in the High Court and assign the same to himself or themselves for disposal without appropriate orders of the Chief Justice.'' তাই আমরা দেখতে পাই দেশের মুখ্য বিচারপতি নিজের মতানুসারে এবং মর্জিমাফিক দীর্ঘদিন থেকে মামলা বিভিন্ন বেঞ্চে বণ্টন করে থাকেন। এই প্রথা বহুদিন ধরে চলে আসছে। যেমন রাজীব গান্ধী হত্যা মামলা, বোফর্স কেলেঙ্কারি মামলা শুনানি হয় বেঞ্চ নম্বর ৮, কয়লা কেলেঙ্কারির শুনানি হয় বেঞ্চ নম্বর ৭ ইত্যাদি, ইত্যাদি। গত কুড়ি বছরে জাতীয় স্তরে স্পর্শকাতর মামলার মধ্যে বেশকিছু মামলা সেইসময়কার প্রধান বিচারপতি সিনিয়র চার বিচারককে প্রদান না করে অধঃস্তনদের এজলাসে পাঠিয়েছেন। এধরনের ঘটনা অহরহ দেশের বিভিন্ন হাইকোর্ট ও জেলা আদালতেও হয়ে থাকে।

চার বিচারপতিও প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের এই ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেননি। কেননা তাঁদের পত্রের তৃতীয় প্যারাগ্রাফে স্পষ্ট লিখেছেন—''One of the well settled principle is that the Chief Justice is the master of the roster with privilege to determine the roster.'' মূলত তাঁদের প্রশ্ন ছিল, এই ক্ষমতা ঠিকভাবে ব্যবহার হচ্ছে কি? যদি সত্যিই এই প্রশ্নই শুধু তাঁদের মনে থাকত, তবে জনতার আদালতে আসার কথা ছিল কি? তবে কেন এই দ্বন্দ্ব? আসলে মেডিক্যাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া ঘুষ কেলেঙ্কারি মামলায় প্রসঙ্গটি বারবারই ঘুরে ফিরে আসছে। মামলাটি তদন্ত করছে সিবিআই। অভিযোগ ছিল বহু বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ এমসিআই-এর নির্দেশিকা মেনে অনুমোদন পেতে ব্যর্থ হয়েছিল। তাদের পক্ষে রায় দেওয়ার বিনিময়ে শীর্ষ আদালতের প্রাক্তন বিচারপতিদের নাম করে মোটা অঙ্কের ঘুষ নেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে ওড়িশা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ইশারত মাসরুর কুদ্দুসিকে। জনস্বার্থ মামলা দায়ের করে বিশেষ তদন্তকারী দল গড়ে এর তদন্তের আর্জি জানান আইনজীবী কামিনী জয়সওয়াল, প্রশান্ত ভূষণ ও দুষ্মন্ত দাভে। দীপক মিশ্রের নিষেধ সত্ত্বেও গত ৯ নভেম্বর বিচারপতি চেলামেশ্বর শুনানি করে পাঁচ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চ গঠনের কথা বলেছিলেন। কিন্তু লিখিত নির্দেশ দেওয়ার আগেই তাঁর কাছে প্রধান বিচারপতির সই করা লিখিত খসড়া নির্দেশ এসে পৌঁছায়। যেখানে সাত সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চ গঠনের কথা বলা হয়। বিচারপতি এ.কে.সিকরি ও বিচারপতি চেলামেশ্বরের নির্দেশ খারিজ করে দেওয়া হয় এবং আরো বলা হয় সাংবিধানিক বেঞ্চ গঠনের প্রশাসনিক ক্ষমতা একমাত্র প্রধান বিচারপতির হাতেই ন্যস্ত। আইন বা নিয়মও সে কথা বলছে। আর এই ঘটনা থেকেই বলা যায় বিদ্রোহের সূত্রপাত।

দ্বন্দ্বের দ্বিতীয় যে কারণ খুঁজে পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে মুখ্যবিচারপতিকে লেখা সাত পাতার পত্রে শুধুমাত্র উল্লেখ করা স্পষ্ট একটি মামলার কথা। সেটা হচ্ছে—আর.পি.লুথরা বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া। আর.পি.লুথরা একজন আইনজীবী। তিনি একটি মামলা করে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন যে যতদিন নিযুক্তি পদ্ধতির সংশোধন করে এম.ও.পি হবে না, ততদিন বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হোক। বিচারপতি আদর্শ কুমার গোয়েল এবং উদয় উমেশ ললিতের বেঞ্চ উক্ত মামলার রায় প্রদান করে দাবি খারিজ করে দেন। ওই রায়ে বলা হয়েছিল বৃহত্তর স্বার্থে এম.ও.পি (MOP) সংশোধন দরকার এবং বিচারকের অশুদ্ধ আচরণের ক্ষেত্রে রুলস তৈরি করা দরকার। চার বিচারকের আপত্তি হচ্ছে ওই বেঞ্চের রায়দানের আগে সাংবিধানিক বেঞ্চের রায়ে পাঁচ বিচারপতির কলেজিয়াম দ্বারা তৈরি এম.ও.পি কেন্দ্র সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছিল। কেন্দ্র সরকার যেহেতু এই ব্যাপারে মৌন, তাই আদালতে সেই পাঠানো এম.ও.পি-কে সিলমোহর দিতে হবে।

দ্বন্দ্বের তৃতীয় যে কারণ খুঁজে পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে, গুজরাট দাঙ্গায় সোহরাবউদ্দিন হত্যা মামলা। ২০০৫ সালে ভুয়ো সংঘর্ষে মারা যান সোহারাবুদ্দিন। গুজরাটে তখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন অমিত শাহ। ওই মামলায় মোট অভিযুক্ত ছিলেন ২৩ জন। প্রথমে অভিযুক্ত ছিলেন অমিত শাহ, পরে আদালতে বেকসুর খালাস পেয়ে যান। সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশে গুজরাটের ঘটনা হলেও ২০১২ সালে মামলাটি মুম্বইয়ে স্থানান্তর করে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় সিবিআইকে এবং নির্দেশে বলা হয় যে বিচারকের অধীনে শুনানি শুরু হয়েছিল, তাঁকে দিয়েই মামলার নিষ্পত্তি করাতে হবে। কিন্তু ওই নির্দেশ লঙ্ঘন করে বিচারক জেটি উৎপটকে সরিয়ে ব্রিজগোপাল হরিকিষেণ লোয়াকে আনা হয়। মামলার বিচারক বি.এইচ.লোয়ার মৃত্যু হয়েছিল ২০১৪ সালের ১ ডিসেম্বর। বিচারক লোয়া ২০১৪ সালের ৩০ নভেম্বর নাগপুরের সহকর্মী বিচারক স্বপ্না যোশির মেয়ের বিয়েতে গিয়েছিলেন। অভিজাত সিভিল লাইন্সের রবি ভবনে বিয়ের অনুষ্ঠান হয়। সেখানে এলাহি বন্দোবস্ত ছিল। কিন্তু রাত সাড়ে বারোটায় বুকে ব্যথা হলে লোয়াকে স্থানীয় ডান্ডে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে মেডিট্রিনা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ওই হাসপাতালেই তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। সত্যিই কি মৃত্যু, না হত্যা? আর এই রহস্য উদঘাটনের জন্য মুম্বই হাইকোর্ট ও সুপ্রিমকোর্টে পৃথক পৃথক মামলা চলছে। গত ১২ জানুয়ারির সাংবাদিক সম্মেলনে বিচারপতি রঞ্জন গগৈ পরোক্ষভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করে ওই মামলার ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। কারণ ছিল চার সিনিয়র বিচারপতিকে বাদ দিয়ে মুখ্য বিচারপতি এই মামলা বিচারপতি অরুণ মিশ্র ও এম.এম. সন্তনাগৌড়ার বেঞ্চকে বিচারের ভার দেন। বর্তমানে এই মামলার গতি-প্রকৃতি নিয়েই চার বিচারপতি ক্ষুব্ধ। কিন্তু তারই পাল্টা সাংবাদিক সম্মেলন করে বিচারক ব্রিজগোপাল হরিকিষেণ লোয়ার পুত্র অনুজ লোয়া বলেন, বাবার মৃত্যুর তদন্ত চান না। এছাড়াও প্রশ্ন উঠছে কেন এই চার বিচারক এই মামলা নিজের কাছে রাখার জন্য জনতার আদালতে সাওয়াল করছেন? কী তাদের উদ্দেশ্য? এরা পরিষ্কার করে বলেননি যে মুখ্য বিচারপতি যার কাছে এই মামলা প্রদান করেছেন তাঁকে নিয়ে কি কোনও সন্দেহ রয়েছে? চার বিচারপতির সাত পাতার পত্রের দ্বিতীয় পাতায় উল্লেখ করা রয়েছে এইরূপ—'It is too well settled in the jurisprudence of this country that the Chief Justice is only the first amongst the equals—nothing more or nothing less''. অর্থাৎ এই কথার মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে সব বিচারপতিই সমান। তাহলে কেন সিনিয়র বেঞ্চ বাদ দিয়ে জুনিয়র বেঞ্চকে দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা হচ্ছে। তাই তাদের অভিযোগের ভিত্তি বা প্রমাণ জনতার আদালতে এইমুহূর্তে একেবারে নড়বড়ে।

বিচারকদের মনে উপরে উল্লেখিত দ্বন্দ্বগুলি হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে তাঁদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। তা ভিতরে মিটিয়ে নিলেই ভালো হতো না? এক্ষেত্রে মুখ্যবিচারপতিও বিশেষ ভূমিকা নিতে পারতেন। আজ চার বিচারপতি বিষয়গুলি জনতার আদালতে ছেড়ে দেওয়ায় পাল্টা বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাই তো ইতিমধ্যে আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ অভিযোগ করে বলেছেন, মেডিক্যাল কলেজে ঘুষ মামলায় মুখ্য বিচারপতি উৎকোচ নিয়েছেন কি না, তার তদন্ত হোক। বিচার ব্যবস্থার সম্মান এমনভাবে ভূলুণ্ঠিত হতো না, আজ যেমন হচ্ছে। আজও আমরা গণতন্ত্রের দুই স্তম্ভের উপরই বেশি আস্থাবান---সেনাবাহিনী এবং বিচার ব্যবস্থা। এখনও আমরা শুনতে পাই যখন দুই ব্যক্তির মধ্যে ঝামেলা হয় তখন একে অপরকে হুমকি প্রদান করে বলে—'কোর্টে দেখে নেব।' সেটা তো শুধু ভরসা ও আস্থার জন্যই বলা হয়। বিশ্বাস আজ নয় তো কাল 'ন্যায় বিচার পাব'। কিন্তু বিচার ব্যবস্থার মন্দিরেই যদি কলঙ্ক প্রবেশ করে তবে আমজনতা কেমন করে মেনে নেবে বিদ্রোহ? ভারত কীভাবে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে? গত ১৫ জানুয়ারি দিনটা ছিল মৃদু ভূমিকম্পের পর প্রথম দিন। আর ওইদিন জাজেস লাউঞ্জে 'চায়ে পে চর্চা'য় সরাসরি প্রথম সাক্ষাৎ হয় একে অন্যের মধ্যে। পরে যথারীতি আদালতের কাজকর্মও চলে। ওইদিন আদালতের কাজকর্ম আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রধান বিচারপতির এজলাসে আইনজীবী আর.পি.লুথরা চার বিচারকের সাংবাদিক সম্মেলনের প্রসঙ্গ টেনে প্রধান বিচারপতিকে বলেন---''আদালত অবমাননা হলে পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। আমরা দেশদ্রোহীদের হাতে প্রতিষ্ঠান ভাঙতে দেব না।'' জনতার আদালতে এখনও প্রশ্ন রয়ে গেছে যে, বিষয়গুলির সমাধান কেমন করে হলো? কীভাবে হল? আদৌ হল কি! চার বিচারপতির বিরুদ্ধে কি কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে! এইসব অসংখ্য প্রশ্ন এখনও জনমনে ঘুরপাক খাচ্ছে।

পরিশেষে, বিচারব্যবস্থার প্রতি নিবিড় শ্রদ্ধা ও আস্থা রেখেই বলছি, বিচার ব্যবস্থায় আশু সংস্কারের প্রয়োজন, যাতে শীর্ষ আদালতের বা অন্যান্য আদালতের প্রতি সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ফিরে আসে। পাশাপাশি আইনপ্রণেতাদের খেয়াল রাখতে হবে, সংসদ সংবিধানের সর্বোচ্চ ধারক ও বাহক, তাই সংসদের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা জরুরি। তেমনি বিচারবিভাগের স্বাধীনতা এবং মর্যাদা রক্ষা করাও অত্যন্ত জরুরি। তা না হলে ভূমিকম্পের রিখটার স্কেল আরোও বাড়তে পারে ভবিষ্যতে। যা দেশের জন্য মোটেই মঙ্গলজনক নয়।

(লেখক পেশায় আইনজীবী)

কংগ্রেস দলেরও কংগ্রেসি সংস্কৃতি এবার ত্যাগ করা উচিত : নরেন্দ্র মোদী

দাভোসে যাওয়ার আগে ইংরেজি সংবাদ চ্যানেল টাইমস নাও-কে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কথায় কথায় উঠে এসেছে নানা প্রসঙ্গ। কংগ্রেসের অবক্ষয়ী সংস্কৃতি থেকে জিএসটি, কৃষক সমস্যা থেকে পাকিস্তান— সব বিষয়েই প্রধানমন্ত্রী অকপট। এবারের স্বস্তিকায় রইল প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎকারের সংক্ষিপ্ত বাংলা অনুবাদ। —স্ব. স.

□ আপনি ক্ষমতায় এসেছেন সাড়ে তিন বছর হয়ে গেল। এই সময়টাকে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন? কী কী করতে পারলেন, কী বাকি থেকে গেল?

নরেন্দ্র মোদী : আমার কাজের মূল্যায়ন যদি আমিই করি সেটা ভালো দেখায় না। ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ করলেই ভালো। আমাদের দেশে সারা বছরই কোথাও না কোথাও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেইসব নির্বাচনের ফলাফলকে একটা মাপকাঠি ধরা যেতে পারে। সেইদিক থেকে বিচার করলে বলতে হয় আমরা খুব খারাপ করিনি।

যদি আপনি আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টা দেখেন, তাহলে দেখবেন সারা বিশ্ব এখন ভারতকে উন্নয়নের প্রেক্ষিতে উজ্জ্বল বিন্দুর সঙ্গে তুলনা করছে। তবে আমি চাই দেশের মানুষ ইউপিএ সরকারের দশ বছরের পারফরম্যান্সের সঙ্গে আমাদের সাড়ে তিন বছরের কাজকর্ম তুলনা করে দেখুক। একমাত্র তখনই মানুষ পরিবর্তনটা বুঝতে পারবেন। আমি খুশি, কারণ যে প্রেরণা থেকে কাজ শুরু করেছিলাম, আজও আমরা সেই পথেরই পথিক। সুনির্দিষ্ট গতিতে এগিয়ে চলেছি। মানুষের প্রত্যাশা পূরণে সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে এবং সেটা সারা দেশ জানে, বিশ্বাস করে। সত্যি কথা বলতে কী, সেটাই আমার সব থেকে বড়ো তৃপ্তি।

একান্ত সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

□ সরকারি হিসেব অনুযায়ী এ বছর ভারতের আর্থিক বৃদ্ধি ৬.৫ শতাংশ। অথচ বিশ্বব্যাঙ্ক বলেছে আগামী বছর সম্ভাব্য বৃদ্ধি হতে পারে ৭.৩ শতাংশ। এর পিছনে কী কারণ থাকতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

নরেন্দ্র মোদী : আপনাদের হয়তো মনে আছে ২০১৩-১৪ সালে ভারতকে বিশ্বের পাঁচটি দুর্বল দেশের অন্যতম হিসেবে গণ্য করা হতো। মনে করা হতো উন্নয়নের দৌড়ে অনেকখানি পিছিয়ে পড়েছে ভারত। আমাদের সৌভাগ্য মাত্র সাড়ে তিন বছরে দুর্বল দেশের তকমা সরিয়ে ভারতীয় অর্থনীতি আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই ঔজ্জ্বল্য আশা এবং প্রত্যাশায় ভরপুর। তিন বছরের গড় হিসেব যদি করেন তাহলে দেখবেন, মুদ্রাস্ফীতি আমরা ১০ শতাংশ থেকে ৩ শতাংশে নামিয়ে এনেছি। বৈদেশিক আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ ৩০ বিলিয়ন ডলার থেকে ৬২ বিলিয়ন ডলার হয়েছে। আর্থিক ঘাটতি ৪.৫ শতাংশ থেকে নেমে এসেছে ৩.৫ শতাংশে। কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ঘাটতি ছিল ৪ শতাংশ। আমরা এই ঘাটতি ১ থেকে ২ শতাংশের মধ্যে রাখতে সক্ষম হয়েছি।

□ গত কুড়ি বছরে আপনিই প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি দাভোসে যাবেন। ভারতের কোন সাফল্যগাথা আপনি সেখানে তুলে ধরতে চান?

নরেন্দ্র মোদী : আমি মনে করি না যা কিছু হচ্ছে সব প্রধানমন্ত্রীর জন্য বা নরেন্দ্র মোদীর জন্য হচ্ছে। ভারত ক্রমশ উন্নতি করছে তাই ভারতকে দেখার আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ বদলে যাচ্ছে। ভারত তার অর্থনৈতিক উত্তরণের সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছে। সেই কারণেই বিশ্ব আজ সরাসরি ভারতের কথা জানতে চাইছে।

আমি একে একটা সুযোগ হিসেবে দেখছি। সঠিক পরিবেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারত আবার মাথা তুলতে শুরু করেছে। আমার দায়িত্ব আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশবাসীর কথা তুলে ধরা। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি ভারতের প্রকৃত ছবি সারা বিশ্বের কাছে তুলে ধরব। সেইসঙ্গে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করার মতো কিছু প্রস্তাবও আমরা দেব।

□ বাণিজ্যের উপযুক্ত দেশ হিসেবে ভারত একলাফে তিরিশ ধাপ উপরে উঠে এসেছে। কিন্তু জীবনধারণের সুবিধার নিরিখে ভারত এখনও অনেকটাই পিছিয়ে। এ ব্যাপারে কী ভাবছেন?

নরেন্দ্র মোদী : আমরা ক্ষমতায় আসার পর ভারত তিরিশ নয়, বাণিজ্যের উপযুক্ত দেশ হিসেবে বিয়াল্লিশ ধাপ ওপরে উঠে এসেছে। তবে আমার ব্যক্তিগত ধারণা হলো, ব্যবসাবাণিজ্যের সুবিধে যতই থাক ভারতের মতো দেশে প্রকৃত লক্ষ্য হওয়া উচিত জীবন ধারণের সুবিধা। যে কারণে আমি চাই সাধারণ মানুষের জীবনযুদ্ধ নামক নরকযন্ত্রণা শেষ করতে। বিশেষ করে সিস্টেমকে আরও স্বচ্ছ করে তোলা দরকার যাতে সিস্টেমের সঙ্গে মানুষের লড়াইয়ে ছেদ পড়ে।

□ আপনার বিরুদ্ধে সব থেকে বড়ো অভিযোগ, আপনি 'গব্বর সিংহ ট্যাক্স' চালু করেছেন। তাছাড়া রয়েছে বেকারি, চাকরি সৃষ্টি করতে না পারা, কৃষিসমস্যা, চাষিদের আত্মহত্যা?

নরেন্দ্র মোদী : আমরা 'এক জাতি এক কর' সিস্টেম চালু করার জন্য কাজ করছি। জিএসটি-র বিরোধিতা কিন্তু কেউ করেননি। অন্তত তাত্ত্বিকভাবে সবাই একে গ্রহণ করেছেন। জিএসটি একটা নতুন পদ্ধতি। আমি সেই প্রথম দিন থেকে বলে আসছি এর সঙ্গে সড়োগড়ো হতে মানুষের একটু সময় লাগবে। যেখানে যেখানে সমস্যা রয়ে গেছে সেগুলো চিহ্নিত করে আমাদেরও দ্রুত সমাধান করতে হবে। একই সঙ্গে দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক এবং দীর্ঘস্থায়ী একটা ব্যবস্থা দেশকে উপহার দিতে হলে প্রত্যেকেরই এই প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া দরকার— সে সরকার হোক কিংবা সাধারণ মানুষ।

□ কর্মসংস্থান আর চাষিদের আত্মহত্যা?

নরেন্দ্র মোদী : কর্মসংস্থান সম্পর্কে মিথ্যে কথা রটানো হচ্ছে। সকলেই জানেন দেশের ১০ শতাংশ মানুষ প্রচলিত ক্ষেত্রে কাজ করেন। বাকি ৯০ শতাংশ করেন অপ্রচলিত ক্ষেত্রে। প্রচলিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান প্রসঙ্গে আমি একটা পরিসংখ্যান দিচ্ছি। এ ব্যাপারে ইপিএফ (এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড) একটা মাপকাঠি হতে পারে। প্রত্যেক বছর ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়েসি ৭০ লক্ষ যুবকযুবতী ইপিএফ-এ অ্যাকাউন্ট খুলছে। চাকরি না পেলে তারা প্রভিডেন্ট ফান্ড অ্যাকাউন্ট খুলবেন কেন?

সারা দেশে সড়ক নির্মাণের হার দ্বিগুণ হয়েছে। বেশি সংখ্যায় লোক নিয়োগ না করে সেটা কীভাবে সম্ভব? রেলপথ নির্মাণের পরিধিও আরও বিস্তৃত হয়েছে। তাতে কি কর্মসংস্থান হয়নি? বৈদ্যুতিকরণ, বন্দর আধুনিকীকরণ ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই কাজের পরিমাণ আগেকার সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। আসলে আমরা এমন কোনও প্রকল্পের কথা ভাবিই না যার সঙ্গে কর্মসংস্থানের বিষয়টি ওতোপ্রোতভাবে জড়িত নয়।

□ আপনি বিদেশে ভারতের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার চেষ্টা করছেন। অথচ কিছু নেতা বিদেশে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সমাবেশে ভারত সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলছেন। এই নেতাদের আপনি কী বলবেন?

নরেন্দ্র মোদী : আজকাল যখন কেউ কোনও এয়ারপোর্ট যান এবং ইমিগ্রেশন কাউন্টারে নিজের ভারতীয় পাসপোর্টটি দেখান তখন তাকে অত্যন্ত সম্ভ্রমের চোখে দেখা হয়। এটাই সকলে বলেন। কিন্তু কোনও নেতা যদি বিদেশে গিয়ে নিজের দেশের অযথা নিন্দেমন্দ করেন কিংবা নেতিবাচক কথা বলেন তাহলে সেটি তার ব্যক্তিগত পরিচয় হয়ে ওঠে, দেশের তাতে কিছুই যায় আসে না।

□ আপনি কংগ্রেসমুক্ত ভারতের কথা বলেন। কংগ্রেস এখন মাত্র চারটি রাজ্যে সীমাবদ্ধ। কী মনে হয়, ভারত কোনওদিন কংগ্রেসমুক্ত হবে?

নরেন্দ্র মোদী : কংগ্রেসমুক্ত ভারতের স্লোগানটি জনপ্রিয় হয়েছে কিন্তু এর পিছনে যে আবেগ রয়েছে সেটা খুব একটা মানুষের কাছে পৌঁছয়নি। কংগ্রেস আমাদের দেশীয় রাজনীতির স্তম্ভস্বরূপ, যার প্রভাব আমাদের দেশের বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলের সংস্কৃতিতে পড়েছে। আমি যখন কংগ্রেসমুক্ত ভারতের কথা বলি তখন কংগ্রেস একটি প্রতিষ্ঠানমাত্র নয়। আমি সেই সংস্কৃতির কথা বলি যা কংগ্রেস সারা দেশে ছড়িয়ে দিয়েছে।

সেই সংস্কৃতি মানে জাতিবাদ, পরিবারতন্ত্র, দুর্নীতি এবং শোষণ। সেইসঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা এবং ক্ষমতার ওপর সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণ। ভারতের মেইনস্ট্রিম রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে এইসবই বোঝায় যার হোতা কংগ্রেস।

সুতরাং আমি যখন কংগ্রেসমুক্ত ভারতের কথা বলি তখন আমার উদ্দেশ্য শুধু ভোটে কংগ্রেসকে হারানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। আমি চাই অন্য দলগুলো তো বটেই, কংগ্রেসও চিরাচরিত কংগ্রেসি সংস্কৃতি থেকে এবার বেরিয়ে আসুক। আমার কংগ্রেসমুক্ত ভারত মানে সেই অবক্ষয়ী সংস্কৃতি থেকে মুক্ত ভারত।

□ তিন তালাক বিল লোকসভায় পাশ হয়েও রাজ্যসভায় আটকে গেল। আপনি নিশ্চয়ই খুব হতাশ?

নরেন্দ্র মোদী : আমি ভেবেছিলাম রাজীব গান্ধীর জমানায় কংগ্রেস যে ভুল করেছিল তার থেকে শিক্ষা নেবে। কংগ্রেস এবং অন্য যেসব দল ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতিতে সিদ্ধহস্ত, তারা এবার হঠকারী মানসিকতা ত্যাগ করে নারীর ক্ষমতায়ণ এবং নারীর প্রতি সম্ভ্রম— এই দুই দৃষ্টিকোণ থেকে গোটা

বিষয়টা দেখবে। তিন তালাক বিল তো কোনও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নয় বা কাউকে ভোটে হারাবার জন্যেও এটা ভাবা হয়নি। এর একমাত্র উদ্দেশ্য দেশের প্রতিটি নাগরিক যাতে আত্মমর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকতে পারেন তার ব্যবস্থা করা।

□ চার বিচারপতির সাংবাদিক সম্মেলন নিয়ে কী বলবেন?

নরেন্দ্র মোদী : আমার মনে হয় এ ব্যাপারে আমার কোনও মন্তব্য করা উচিত হবে না। সরকার এবং রাজনৈতিক দলগুলির দূরে থাকাই ভালো। আমাদের বিচারবিভাগ অতি দক্ষ। সেখানে যোগ্য লোকজনেরা আছেন। তাঁরা নিজেরাই তাঁদের সমস্যার সমাধান করতে পারবেন।

□ বিরোধী দলগুলি বিজেপির শীর্ষস্থানীয় নেতাদের বিচার বিভাগের সমস্যার সঙ্গে জড়াতে চাইছে। আপনি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময়েও এরকম একবার ঘটেছিল।

নরেন্দ্র মোদী : বিরোধীরা নরেন্দ্র মোদীকে শেষ করে দেবার জন্য বহু চেষ্টা করেছেন। আমি কিন্তু প্রত্যেকবার তাঁদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছি।

□ কিন্তু ওরা তো এখনও একই খেলা চালিয়ে যাচ্ছে।

নরেন্দ্র মোদী : ওরা যা করতে চান, করুন। ওদের আচরণই তো আমাকে এখানে পৌঁছে দিয়েছে।

□ আপনি জনমোহিনী রাজনীতির বিরোধী। কিন্তু নির্বাচনের আর বেশি দেরি নেই। এবারের বাজেটে নিশ্চয়ই মানুষকে সন্তুষ্ট করার মতো কিছু করবেন?

নরেন্দ্র মোদী : বাজেট সংসদের ব্যাপার। অর্থমন্ত্রীর এক্তিয়ারে পড়ে। আমি অযথা নাক গলাতে চাই না। কিন্তু যাঁরা আমায় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখেছেন, আবার এখন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখছেন, তাঁরা আমার কাজের ধরন জানেন। আমি বিশ্বাস করি সাধারণ মানুষ অন্যায় সুযোগসুবিধা চান না। তাঁরা সততা চান। যতটা প্রাপ্য সেটা পেলেই তাঁরা খুশি। আমরা একটা সরকার চাই। আমাদের সেই বাজেটই করতে হবে যা সাধারণ মানুষের প্রয়োজন এবং ন্যায্য আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে সক্ষম।

□ কৃষিসমস্যা আর চাষিদের ক্ষোভ নিয়ে কী বলবেন?

নরেন্দ্র মোদী : এক্ষেত্রে সরকারের সমালোচনা যুক্তিযুক্ত। আমরা কোনওভাবেই এড়িয়ে যেতে পারি না। এটা সারা দেশের দায়িত্ব, প্রতিটি রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব। আমার দায়িত্ব কৃষকদের সমস্যাগুলি ঠিকমতো বোঝা এবং তার সমাধান করা। কিছু কিছু ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছে। যেমন প্রধানমন্ত্রী ফসলবিমা যোজনার মাধ্যমে কৃষকদের অনুদান দেওয়া হচ্ছে। এই যোজনায় কৃষকেরা তাদের মোট উৎপাদন ব্যয়ের মাত্র ২ শতাংশ বহন করবেন। বাকিটা বহন করবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র।

কৃষকদের দুটি প্রধান সমস্যা হলো বিদ্যুৎ এবং জল। আমরা ৯৯টি প্রকল্প গ্রহণ করেছি যেখানে রিজার্ভের রেডি। ড্যামও তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু এই বিপুল জলসম্পদ সেচের প্রয়োজনে কীভাবে চাষিদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় সে ব্যাপারে কেউ এখনও পর্যন্ত এগিয়ে আসেননি। যাইহোক, ৪০-৫০টি সেচপ্রকল্প আমরাই অধিগ্রহণ করেছি। ভবিষ্যতে আরও করব।

পাশাপাশি সয়েল হেলথ কার্ড ক্যাম্পেনের কাজ চলছে। এই প্রকল্পে মাটি পরীক্ষা করা হচ্ছে। কোটি কোটি কৃষক তাদের কৃষিজমির মাটি পরীক্ষা করার জন্য স্যাম্পেল পাঠিয়েছেন।

প্রসঙ্গত একটা কথা বলি। একটা সময় ছিল যখন চাষিদের বিনামূল্যে ইউরিয়া সার সংগ্রহ করার জন্য সারারাত লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। ব্যাপারটা আমি নিজে খতিয়ে দেখেছি। আমি যদি নতুন কারখানা তৈরির কথা ভাবি তাহলে তিন-চার বছর সময় লেগে যাবে। তাই আমি যেসব কারখানা আছে সেগুলোর আধুনিকীকরণের ব্যবস্থা করেছি যাতে কুড়ি লক্ষ টন বাড়তি ইউরিয়া উৎপাদন করা যায়। বন্ধ কারখানাগুলো খোলার চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি নিমের অস্তরণ দেওয়া ইউরিয়া উৎপাদন শুরু হয়েছে। এতে ডাইভারশন অনেকটাই বন্ধ করা যাবে। আমার পরের লক্ষ্য ভারতের কৃষিজমিতে সৌরবিদ্যুৎ চালিত পাম্প চালু করা।

মূল্য সংযুক্তি (ভ্যালু অ্যাডিশন) আজকাল খুবই জরুরি। আপনি যদি কাঁচা আম বিক্রি করেন তাহলে কম দাম পাবেন। পাকা আম বিক্রি করলে আপনার আয় বাড়বে। আপনি যদি কাঁচা আম থেকে আচার তৈরি করেন তাহলে আয় আরও বাড়বে। আবার যদি প্যাকেজিং ঠিকমতো হয় আয় আরও একটু বাড়বে। এরপর যদি কোনও সেলিব্রিটি আপনার প্রোডাক্টের কথা গণমাধ্যমে বলেন তাহলে তো কথাই নেই। ভারতের কৃষকদের এই মূল্যসংযুক্তির ব্যাপারটা বুঝতে হবে।

□ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প-সহ আন্তর্জাতিক রাজনীতির নেতাদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক খুবই ভালো। এই সম্পর্কই পাকিস্তানকে আন্তর্জাতিক স্তরে একঘরে করে দিয়েছে। এ ব্যাপারে কী বলবেন?

নরেন্দ্র মোদী : আপনি যদি মনে করেন ভারতের বিদেশনীতি শুধুমাত্র পাকিস্তানকে কেন্দ্র করে আবর্তিত, তাহলে সেটা বিরাট ভুল হবে। সারা বিশ্বের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের প্রেক্ষিতে বিদেশনীতি নির্ধারিত হয়। এটা ইস্যুভিত্তিক বিষয়। একটি দেশের কথা মাথায় রেখে বিদেশনীতি তৈরি হয় না, হওয়া উচিতও নয়। তবে হ্যাঁ, সারা বিশ্ব এখন সন্ত্রাসবাদের বিপদ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।

কোনও দেশ যদি সন্ত্রাসবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয় তাহলে তারা আন্তর্জাতিক মঞ্চে একঘরে হবেই। ডোনাল্ড ট্রাম্প সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করার যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি। আর পাকিস্তানের কথা যদি বলেন তাহলে বলব, পাকিস্তান আর ভারত যুদ্ধক্ষেত্রে অনেকবার লড়েছে। পাকিস্তানের নেতারা আসুন, এবার আমরা বরং একসঙ্গে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করি। অসুখ বিসুখের বিরুদ্ধে লড়াই করি। এ ব্যাপারে আমি পাকিস্তানের মানুষের সঙ্গে কথা বলতেও রাজি। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধ তিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

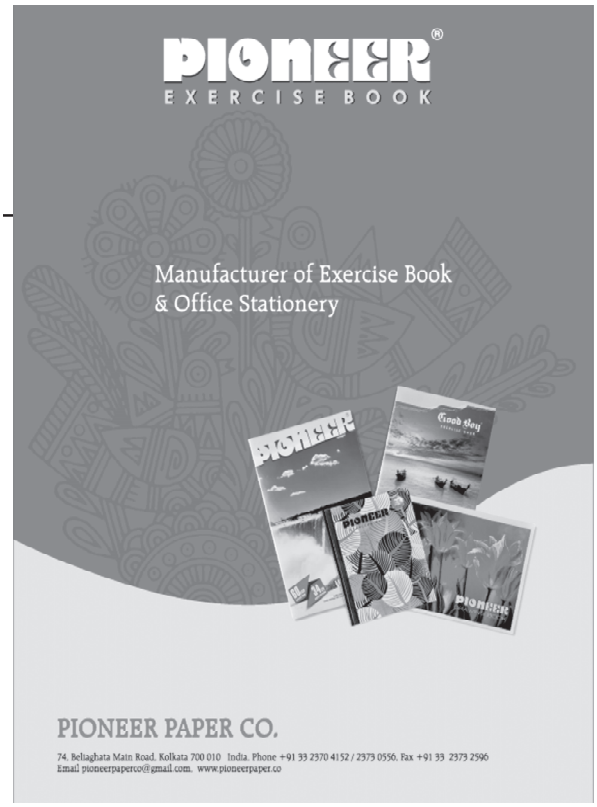

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

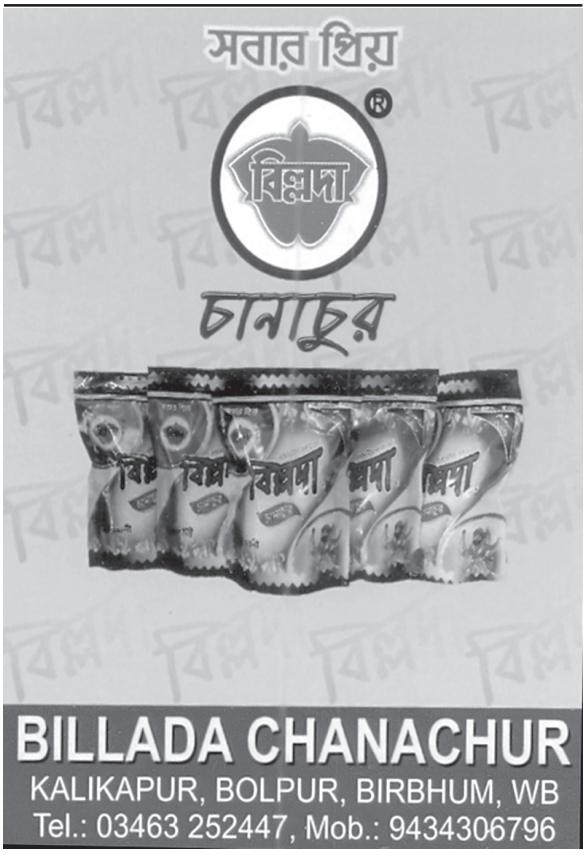

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

পশ্চিমবঙ্গে এন. আর. সি.-র তত্ত্বাবধানে জনগণনা হওয়া দরকার

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস

গত ১৯ জানুয়ারি ২০১৮ মেয়ো রোডে একটি জমায়েত হয়। সংগঠক সারা বাংলা সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশন (All Bengal Minority Youth Fedaration)। এমনিতে এই সংগঠনটি উগ্র মৌলবাদী। বেকার হস্টেল থেকে বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের মূর্তি অপসারণের দাবি তুলে এই সংগঠন আর তার সম্পাদক মো. কামারুজ্জামান অনেকের নজর কেড়েছেন। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা বেকার হস্টেলে থাকাকালীন কতটা অসাম্প্রদায়িক ছিলেন, সাহেদ সোহরাবর্দির রাজত্বকালে ছেচল্লিশের হিন্দু হত্যার দিনগুলিতে তাঁর কী ভূমিকা ছিল, এ নিয়ে তিক্ত প্রশ্ন তুলে লাভ নেই। এখনকার প্রসঙ্গ অন্য। মেয়ো রোডের মোড়ে উক্ত বিক্ষোভ সমাবেশের উদ্দেশ্য ছিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘোষণা—জেরুজালেম হবে ইজরায়েলের রাজধানী। এর মাধ্যমে প্যালেস্টাইনের অধিকার খর্ব হচ্ছে—অতএব আন্দোলন প্রতিবাদ তীব্র করেছে বাংলার মুসলমান যুব সমাজ। বাংলাভাষার লেখক তসলিমা নাসরিনকে বাংলা-ছাড়া করার সময় এদের বাঙালিয়ানা জাগে না! অথচ কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরের প্যালেস্টাইন নিয়ে এদের ইসলামি সত্তা জেগে ওঠে।

সব থেকে আশ্চর্য ওই বিক্ষোভ-সমাবেশে হাজির ছিল কয়েকজন রোহিঙ্গা যুবক। কেন তারা এই ইসলামি আন্তর্জাতিকতার প্রতি এত টান অনুভব করল তা নিয়ে একটি ইংরেজি দৈনিকের সাংবাদিক সৌগত রায় কামারুজ্জামানকে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর এড়িয়ে গেছেন (টাইমস অব ইন্ডিয়া' ; ২০.১.২০১৮)। জানা গেছে এরা বারুইপুর থানা, ঘুটিয়ারি শরিফের কাছে হাড়দহ গ্রামে হোসেন গাজির তত্ত্বাবধানে গড়া 'দেশ বাঁচাও সামাজিক কমিটি'-র তৈরি রোহিঙ্গা-আশ্রয় শিবিরের। কদিন আগে সেখানে কামারুজ্জামান গিয়েছেন। আশ্রয় শিবিরবাসীদের যথাসম্ভব অর্থ সাহায্য করে এসেছেন। দেশব্যাপী রোহিঙ্গাদের অধিকার নিয়ে বামপন্থী ধর্মনিরপেক্ষ হিন্দুবিরোধী শক্তি গড়েছেন 'রোহিঙ্গা হিউম্যান ইনিশিয়েটিভ'। আর তারা নানা অঞ্চলে এইসব রোহিঙ্গাদের বৈধতা দেবার চেষ্টা চালাচ্ছেন। পরিচয়পত্র জোগাড় করছেন! 'ইউনাইটেড নেশনস হাই কমিশন ফর রিফিউজি' (UNHCR)-র পরিচয়পত্র দেবার ক্ষেত্রে একটি চক্র সক্রিয় হয়েছে। হোসেন গাজি ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন---এইসব বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের বিধিবদ্ধ পরিচয়পত্র সরবরাহ করার জন্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি এর আগে বহু বিবৃতি, ঘোষণাতে স্পষ্ট। আরও স্পষ্ট হল বারুইপুরের পুলিশ সুপার 'জনাব' অরিজিৎ সিংহের উক্তি থেকে। তাঁর স্পষ্ট কথা UNHCR-এর পরিচয়পত্র থাকলে আশ্রয় শিবির চালানো যায়, আর অবৈধ নাগরিকদের অনুপ্রবেশকারী বলা যাবে না! তাদের ভিসা-পাশপোর্টের দরকার নেই!

পশ্চিমবঙ্গের ২২০০ কিমি সীমান্ত বরাবর বাংলাদেশ থেকে কী বিপুল পরিমাণ অবৈধ অনুপ্রবেশ হচ্ছে তা বোঝাবার জন্য রোহিঙ্গাদের এই অবৈধ শিবির আর দেশদ্রোহী তৃণমূল সরকারের জেহাদি কার্যকলাপ আর স্থানীয় মুসলমানদের বাড়বাড়ন্ত বোঝানোর জন্য এই কথাটুকু বলে নিতে হল। বস্তুত পশ্চিমবঙ্গ এখন এই নির্লজ্জ মুসলমান তোষণকারী সরকারের ষড়যন্ত্রে বাংলাদেশিদের মুক্তাঞ্চল হয়ে গেছে—কোনও সন্দেহ নেই।

রোহিঙ্গা শিবিরে টাকা বিলোচ্ছেন হোসেন গাজি।

১৯৭১ নাগাদ পূর্ব বাংলায় পশ্চিম পাকিস্তানি বর্বরতার সময় কয়েক কোটি শরণার্থীকে আমরা স্বেচ্ছায় সোৎসাহে আশ্রয় দিয়েছি। এখন সেই পরিস্থিতি নেই। পূর্ব বাংলার মুসলমানদের ষোলো আনা মুসলমান বলেই স্বীকার করেনি পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক শাসকরা। তারা ব্যাপক বলাৎকার, খুন-জখম-রাহাজানি করে সন্ত্রস্ত করতে চেয়েছে। এর কারণ হিসাবে কোনও কোনও পশু স্বভাবের লোক একথাও বলেছে যে, তারা চায় এর ফলে নাকি পূর্ব পাকিস্তানে এক দল 'ধর্মপ্রাণ' মানুষ জন্মাবে যারা পশ্চিম-পাকিস্তানি জিন বহন করবে! এসব কথা আমরা অতিশায়ন বলেই জানি। কিন্তু ১৯৭৫-এ মুজিবুর রহমানের সপরিবার নিধন আর কিছুদিনের মধ্যে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দ

সরিয়ে বাংলাদেশের সংবিধান 'ইসলামি রাষ্ট্র'-এর তকমা পড়ল, ১৯৯২-এর পর হিন্দু বিরোধী মানসিকতা তীব্র হল। তথাকথিত বাবরি ধাঁচা ভেঙে যাওয়ার পর বাংলাদেশে একটি মন্দিরও কলুষিত হওয়া বা ভেঙে ফেলার হাত থেকে বাঁচেনি। পরিস্থিতি কত ভয়ঙ্কর তা বোঝাবার জন্য পরিসংখ্যানের দরকার নেই। পশ্চিমবঙ্গে কয়েক কোটি ১৯৭১-পরবর্তী বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ করেছে—চোখ কান খোলা রাখলেই তা পরিষ্কার হবে। বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন গবেষক এই বিষয়ে একমত যে আর বছর কুড়ির মধ্যে বাংলাদেশে একজন হিন্দুও থাকবে না!

২০১৫-র সেপ্টেম্বর আর ২০১৬-র জুলাইতে ভারত সরকার নাগরিকত্ব বিধি প্রণয়ন করেছে। পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল-কংগ্রেস আর বামপন্থীরা এই বিধিকে সিলেক্ট-কমিটিতে আটকে রেখেছেন। ডেরেক ও ব্রায়ান, প্রদীপ ভট্টাচার্য বা মো. সেলিম—যাঁরা ওই কমিটির সদস্য তাঁদের মনোভাব আলাদা করে দেখাবার কারণ নেই। ওই আইনে পার্সি-শিখ-খ্রিস্টান-বৌদ্ধ আর অবশ্যই হিন্দু ধর্মের কেউ আফগানিস্তান-পাকিস্তান-বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর যেকোনও প্রান্ত থেকে এদেশে নাগরিকত্বের আবেদন করলে তাদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে। এতে গাত্রদাহের একটাই কারণ, এইসব দল আসলে ধর্মের কারণে বিভাজিত ভারতকে মুসলমানদের মুক্তাঞ্চল করতে চায়।

১৯৭১-এ অসমে মুসলমান ছিল ৫% ; এখন তা বেড়ে হয়েছে ৩০% । ২০১১-তে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান ছিল ২৭% । কিছুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এ রাজ্যে মুসলমান হচ্ছে ৩২% , তাদের তিনি 'কোটিবার তোষণ করবেন।' পাঁচ ছ'বছরের মধ্যে সংখ্যাটা এমন অস্বাভাবিকভাবে বাড়ল কেন? এ নিয়ে প্রশ্ন করলে হিন্দু নাম পদবীধারী কোনও কোনও বিশেষজ্ঞ বলবেন, এটা ঠিক নয়। এটা আসলে ভুল ব্যাখ্যা---ইত্যাদি বলে আরবি-দিনারের ঢেকুর তুলতে থাকবেন! অসমের যুবসমাজ আটের দশকে অনুপ্রবেশের সমস্যাটা বুঝেছিলেন, তাঁরা

এন.আর.সি.-র তত্ত্বাবধানে পশ্চিমবঙ্গেও জনগণনা হোক। এই দাবিতে এক জোট না হতে পারলে বাঙালি মধ্যবিত্ত চতুর ধর্মনিরপেক্ষরাও কিন্তু জাল কেটে বেরুতে পারবেন না—মৌলবাদীরা পুকুর কেটে ফেলেছে সর্বত্র।

তীব্র আন্দোলন করেছিলেন। বলতে দ্বিধা নেই, সেই আন্দোলনের অভিমুখ ছিল দ্বিমুখী—১. তারা মুসলমান বাংলাদেশিদের সনাক্ত করে, বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে চাইছিলেন। ২. ব্রহ্মপুত্র আর বরাক উপত্যকার ভারতীয় বাঙালিদেরও তারা অনুপ্রবেশকারী বলে ধরতে চেয়েছিলেন। অসমিয়া স্বাভিমান আর আত্মরক্ষার সেই দাবি বাঙালির পক্ষে বিপজ্জনক ছিল। অবস্থা বদলেছে। এখন সবাই স্বীকার করবেন, অসম এখন বিরাট বাঁকের সামনে দাঁড়িয়ে। অসমিয়ারা ভাষা সংস্কৃতির স্বকীয়তা বাঁচাতে গিয়ে 'পোয়ামক্কা'-র শয়তানদের হাতে ধর্মও বিসর্জন দেবেন কিনা, আর বাংলাদেশিদের ক্রমবর্ধমান চাপে—একবার উদ্বাস্তু হওয়া বাঙালি বাঙালিয়ানা রক্ষা করতে 'জাতি-মাটি-বেটি' মুসলমানদের কাছে জিম্মা রাখবেন কিনা—এ প্রশ্নের জবাব পেতে হবে। অসমিয়া ও বাঙালি সমাজ এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেয়েছেন। তাই সেখানে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১৫.৮.১৯৮৫-তে অসম চুক্তি রচিত হয়। এর ৫.১ ধারায় আছে ১.১.১৯৬৬-কে ভিত্তিবর্ষ ধরে ১৯৫৫-র নাগরিকত্ব আইনের ৬/এ ধারা বলে নাগরিকত্ব তালিকা তৈরি হবে। মহামান্য উচ্চতম আদালত ১৭.১২.২০১৪-তে নতুন করে নাগরিক তালিকা তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্টের রায়কে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আলিপুরদুয়ারে জনসভায় বলেছেন, 'ভারতের নাগরিকরা যে কোনও রাজ্যেই বাস করার অধিকারী। অসমে 'বঙ্গাল খেদা'-র চক্রান্ত হচ্ছে।' এসব কথা তিনি বলেছেন হয়তো পশ্চিমবঙ্গের বিকিয়ে যাওয়া দিনার-প্রিয় সংবাদমাধ্যমের দায়িত্বজ্ঞানহীন কথাবার্তা থেকে। ঠিকই তো, ভারতের নাগরিক হলে যে কোনও রাজ্যেই বসবাস করতে, কাজকর্ম করতে পারেন।

মাননীয়া কি জানেন, এন.আর.সি. (National Register of Citizen) তাদের কাজ করার সময় অসমের বহু মানুষের নাম ঠিকানার একটি বড় তালিকা পাঠিয়েছিলেন। এদের বংশলতা, স্থায়ী ঠিকানা জানতে চেয়েছিলেন। প্রায় দু'লক্ষ মানুষের এই তালিকা! পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ দপ্তরের কোনও 'জনাব' এর জবাব দেননি। এখন যদি বলা হয়, এরা বে-আইনি অনুপ্রবেশ করে রাজ্যে ঢুকে 'আব্বা'-ভাড়া করে আধার কার্ড সংগ্রহ করেছে! খুব আপত্তি করা যাবে? বিশেষ করে যখন রাজ্যের নানা স্থানে এভাবে বাড়িভাড়া-'আব্বা-ভাড়া' করে আধার কার্ড সংগ্রহ করে অন্যপ্রদেশে কসাইখানা চালিয়ে পাশপোর্ট সংগ্রহের সংবাদ জানা যাচ্ছে!

কিছুদিন আগে মুম্বই শহর থেকে একটি বিশেষ ট্রেন আসছিল। অবৈধ বাংলাদেশিদের নিয়ে আসা এই বিশেষ ট্রেনটিকে অবরোধ করে সারাদিন ধরে থামিয়ে দেন স্থানীয় বাম বিধায়ক আর তার চেলারা। পুলিশ আসে। উলুবেড়িয়া স্টেশনে অবরুদ্ধ ট্রেনটি তখন ফাঁকা! ধুলাগড়ের হিন্দু-বিরোধী একতরফা খুন-রাহাজানি-গুণ্ডামির পিছনে এইসব বীর জেহাদিদের ভূমিকা আছে কিনা ঠিকমতো সন্ধান করলে জানা যাবে। স্থানীয় ইস্কুলে সরস্বতী পুজো করার দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে বাগদি কিশোরী প্রিয়া-র মাথা ফাটিয়েছিল একদল বীর পুলিশ। তেহট্ট ইস্কুলের প্রধান শিক্ষককে উদ্দেশ্য করে এক জেহাদি বক্তৃতা দিয়েছিল : 'জাল ছিড়ে পালিয়েছ—পুকুর ছেড়ে পালাতে পারোনি।' ঠিক কথা, গোটা পশ্চিমবঙ্গ এখন মৌলবাদী অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর পুকুর হয়ে গেছে। অবিলম্বে আন্দোলন শুরু করতে হবে—এন.আর.সি.-র তত্ত্বাবধানে পশ্চিমবঙ্গেও স্বচ্ছ জনগণনা হোক। এই দাবিতে এক জোট না হতে পারলে বাঙালি মধ্যবিত্ত চতুর ধর্মনিরপেক্ষরাও কিন্তু জাল কেটে বেরুতে পারবেন না—মৌলবাদীরা পুকুর কেটে ফেলেছে সর্বত্র। ■

পশ্চিমবঙ্গে নাগরিকপঞ্জী নবীকরণের কাজ অবিলম্বে শুরু করা প্রায়োজন

পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার এখন ইসলামি মৌলবাদীদের হাতের পুতুল। সরকার, পুলিশ, বুদ্ধিজীবী, মিশন-সেবাশ্রম—সবাই ইসলামি মৌলবাদীদের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছে।...বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে, বিতাড়ন করেই একমাত্র নতুন পশ্চিমবঙ্গ গড়া যাবে। নইলে এর একমাত্র ভবিষ্যৎ পশ্চিম বাংলাদেশ হয়ে যাওয়া।

মোহিত রায়

অসমে জাতীয় নাগরিকপঞ্জী নবীকরণ নিয়ে এখন প্রচুর আলোচনা চলছে। পশ্চিমবাংলার পত্রপত্রিকা, যা এখনো বাম-সেকুলার অর্থাৎ হিন্দু-বিরোধী মুসলমান তোষণপন্থী মতেই চলছে, তারা অনেকদিন পর আবার বাঙালি আবেগে তুমুল সুড়সুড়ি দিয়ে অসমে বাংলাদেশি মুসলমান বিতাড়নের এই মহান উদ্যোগকে নিন্দায় ভাসিয়ে দিচ্ছে। অসমের বরাক উপত্যকার কিছু বামপন্থী হিন্দু বুদ্ধিজীবীও বাঙালি আবেগে কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছেন। অসমের এইসব ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের সামনে নিজের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবার এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে। অসমের মানুষ বাংলাদেশি মুসলমানের বোঝা আর বইতে চান না, এটা পরিষ্কার তাঁরা জানিয়েছেন। এই সমস্যা পশ্চিমবঙ্গেও। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের আগামী নির্বাচনের একটি প্রধান বিষয় হতে পারে নাগরিকপঞ্জী নবীকরণ। দিল্লির নেতারা এটা না বোঝা পর্যন্ত অবশ্য তেমন কিছু হওয়ার আশা কম।

বাঙালিদের সমস্যাটা কী, সেটা অল্প কথায় প্রথমে বুঝে নেওয়া যাক। ১৯৮৫ সালে রাজীব গান্ধীর কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে সারা অসম ছাত্র ইউনিয়নের (আসু) যে চুক্তি হয়, সেই চুক্তি অনুযায়ী অসমে বসবাসকারী মানুষদের পরিচিতি নির্ধারণের জন্য ও বিদেশিদের চিহ্নিতকরণের জন্য নাগরিকপঞ্জীর নবীকরণের কথা বলা হয়। এই নবীকরণের জন্য সব অসমবাসীকে নথিপত্র জমা দিতে বলা হয়। এর মধ্যে এই বিষয়টি নিয়ে বেশ কিছু মামলা মোকদ্দমা হয়েছে, বেশ কিছু আইনি জটিলতাও রয়েছে (এবিষয়ে স্বস্তিকার ১৫ জানুয়ারি ২০১৮ সংখ্যায় ধর্মানন্দ দেবের নিবন্ধটি পড়ুন)। তবু এতদিনের পড়ে থাকা গুরুত্বপূর্ণ কাজটি বিজেপি নেতৃত্বের সরকার ক্ষমতায় আসার পর দ্রুতগতিতে এগোতে থাকে। মনে রাখতে হবে এই কাজটি সম্পূর্ণ করা বিজেপি জোটের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতেও ছিল। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট একটি আদেশ দেয় যে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে এই নতুন নাগরিকপঞ্জী প্রকাশ করতে হবে। অসম সরকার আরও সময় চেয়েছিল, কিন্তু আরও বিলম্ব ঠেকাতে যতটা তালিকা হয়েছে ততটা প্রকাশ করার কথা দেয়। সুতরাং এটি প্রথম তালিকা, এতে ১ কোটি ৯০ লক্ষ নাগরিকের নাম রয়েছে। অসমের লোকসংখ্যা অনুযায়ী আরও ১ কোটি ৩০ লক্ষ নাগরিকের নাম এখনো নেই। এঁরা সবাই ভারতীয় নগরিক কিনা সেই তালিকা প্রকাশিত হবে কিছু পরেই। অর্থাৎ একটি দ্বিতীয় তালিকা প্রকাশিত হবে। এই দ্বিতীয় তালিকা না প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত বাঙালিদের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে বলে যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এটা বোঝা দরকার একজন অসমিয়া মানুষের নথিপত্র খুব একটা দেখার দরকার পরে না, কারণ তাঁরা বিদেশি হতে পারেন না। কিন্তু একজন বাংলাভাষীর নথিপত্র ভালো করে যাচাই করা দরকার, কারণ তাঁরা বাংলাদেশের অর্থাৎ বিদেশি হতে পারেন। এই কারণে প্রথম তালিকায়

পঞ্জীকরণের কাজ চলছে।

অসমিয়া ও অসমের অন্যান্য জাতি-উপজাতির মানুষের নাম আগে এসে গেছে, বাংলাভাষীদের ক্ষেত্রে তা ততটা আসেনি। এই বাংলাভাষীদের মধ্যে যাঁরা ১৯৭১ সালের আগে থেকেই অসমে থাকেন তাঁদের কোনও সমস্যা হবে না। ১৯৭১-এর পর বাংলাভাষী হিন্দু যাঁরা অসমে এসেছেন, তাঁদের নাম আপাতত তালিকায় না উঠলেও তাঁরা আইনত অসমে থাকতে পারবেন। এর কারণ ৭ নভেম্বর ২০১৫ সালে কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার পাসপোর্ট আইন ও বিদেশি আইন সংশোধন করে বাংলাদেশ থেকে আসা সংখ্যালঘু হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানদের ভারতে আইনি বসবাসে অনুমতি দিয়েছে। আগামী দিনে তাঁরা যাতে নাগরিকত্ব পান তার জন্য লোকসভায় নতুন বিল পেশ করা হয়েছে। সুতরাং বাঙালিদের যদি কিছু লোকের নাম দ্বিতীয় তালিকাতেও না ওঠে তাতে বড় কোনও সমস্যা হচ্ছে না। তাহলে বাঙালিদের নিয়ে এত চিন্তা কেন? আসলে চিন্তায় রয়েছেন অসমের ৩০ লক্ষ বাংলাদেশি মুসলমান। এই বাংলাভাষী বিদেশিরা মূলত বাঙালি নন, এঁরা কয়েক হাজার বছরের ভারতীয় সংস্কৃতির অনুসারী নন, এঁরা বাংলাভাষী মাত্র। এই বাংলাদেশি মুসলমানদের জন্যই পশ্চিমবঙ্গের কাগজে এত হৈচৈ। বাঙালি আবেগ তুলে আসলে রক্ষা করতে চাইছে বাঙালি নয়, বাংলাভাষী বিদেশিদের। সেকুলার পশ্চিমবঙ্গে তাই এই বিদেশি অনুপ্রবেশকারীদের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে ইসলামি মৌলবাদীদের সমর্থক তৃণমূল কংগ্রেস ও সিপিআইএম।

অসমে মুসলমান অনুপ্রবেশ

অসমে মুসলমান অভিযান হয়েছে, তবে পুরো অসম কখনও মুসলমান শাসনের অধীন হয়নি। মোগল আমল থেকে কিছু মুসলমান অসমে বসবাস শুরু করলেও মূল অসমে মুসলমানদের সংখ্যা কম ছিল। শ্রীহট্টের অসমে যোগদানে ব্রিটিশ অসমে মুসলমানদের রাজনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। অসমে মুসলমানদের দ্রুত বৃদ্ধি হয় ১৯২১ থেকে ১৯৪১-এ। এই কুড়ি বছরে এক লাফে প্রায় ৭ শতাংশ বেড়ে যায় মুসলমান জনসংখ্যা। দেশভাগের আগে ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত অসমে মূলত ছিল মুসলিম লিগের শাসন আর তার প্রধানমন্ত্রী (মুখ্যমন্ত্রী) ছিলেন সার সৈয়দ মহম্মদ সাদুল্লা। বাগদাদ থেকে এসে অসমে বসবাসকারী এই পরিবার

অসমে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি

বর্ষ	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১	১৯৫১
মুসলমান %	১৫.০৩	১৬.২৩	১৮.৭৪	২২.৭৮	২৫.১৩	২৪.৬৮
বর্ষ	১৯৬১	১৯৭১	১৯৮১*	১৯৯১	২০০১	২০১১
মুসলমান %	২৫.৩	২৪.৫৬	২৬.৪৯	২৮.৪৩	৩০.৯১	৩৪.২২

**এটি ১৯৭১ ও ১৯৯১-র গড়। ১৯৮১তে অসমে জনগণনা হয়নি।*

বাংলাদেশি মুসলমানদের জন্যই পশ্চিমবঙ্গের কাগজে পঞ্জীকরণের বিরোধিতা করে এত হৈচৈ। বাঙালি আবেগ তুলে আসলে রক্ষা করতে চাইছে বাঙালি নয়, বাংলাভাষী বিদেশিদের। সেকুলার পশ্চিমবঙ্গে তাই এই বিদেশি অনুপ্রবেশকারীদের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে ইসলামি মৌলবাদীদের সমর্থক তৃণমূল কংগ্রেস ও সিপিআইএম।

অসমের ইতিহাসে খুব গুরুত্বপূর্ণ। সাদুল্লা-র কৃতিত্ব যে তিনি দক্ষিণ অসমে পরিকল্পিত ভাবে বাঙালি মুসলমান কৃষকদের বসতির ব্যবস্থা করে এই অংশের জনমানচিত্র পাল্টে দেন। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় অসমিয়ারা তাই শ্রীহট্টের বোঝাটি অসমের ঘাড় থেকে নামিয়ে ফেললেন। এক বিতর্কিত গণভোটে শ্রীহট্ট পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হল। স্বাধীনতার পরে এই নতুন অসমে অসমীয়া জাতীয়তাবাদ শক্তিশালী হল। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকেঅসমের বাঙালি হিন্দু অধিবাসীদের বিরুদ্ধে 'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলন খুব সহজে জয়লাভ করে। এসময় ব্যাপক গরিব কৃষক বাংলাভাষী মুসলমান যারা তাদের মুসলমান পরিচিতির বাইরে কখনও বাঙালি জাতীয়তাবাদ নিয়ে মাথা ঘামাননি, তাঁরা নিজেদের নব-অসমিয়া পরিচয় দিতে থাকলেন, জনগণনায় অসমিয়াভাষীদের সংখ্যা বেড়ে গেল অনেক। এই 'বঙ্গাল খেদায়' ভীত হয় তৎকালীন অসমের অন্যান্য ভাষাভাষী জাতি-উপজাতিরা। সংখ্যায় বাঙালির থেকে অনেক কম হলেও বাঙালি হিন্দুর মতো নরম বা কাপুরুষ তারা নয়। তাই বাঙালি হিন্দুর বিরুদ্ধে সম্প্রসারণবাদী হুজুগ তোলা অসমিয়া সমাজ দেখল মাত্র এক দশকে বিশাল অসম ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। নাগা, মিজো, খাসি, গারো কেউই অসমে থাকতে রাজি হল না।

এক দশকের মধ্যেই নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মেঘালয় আলাদা রাজ্য হয়ে গেল। ব্রহ্মপুত্র নদের দুইপাশে এক করিডোরসম মানচিত্র হল খণ্ডিত অসমের। সেই করিডোরের পশ্চিমে পশ্চিমবাংলা সংলগ্ন প্রায় শতকরা একশভাগ বাংলাভাষী ধুবরী বা দক্ষিণপূর্বে ত্রিপুরা সংলগ্ন একশভাগ বাংলাভাষী কাছাড় অসম থেকে আলাদা হওয়ার কথা বাঙালি মিন মিন করে বলারও সাহস করে উঠতে পারলো না।

সারণি দেখলে পরিষ্কার বোঝা যাবে যে, ১৯০১ থেকে ৪০ বছরে ১৯৪১-এ অসমে মুসলমানদের সংখ্যা ১৫% থেকে বেড়ে ২৫% ছাড়িয়েছে যা নিশ্চয়ই যে কোনও জায়গার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্নের। এই বৃদ্ধি যে শুধু জন্মহারের জন্য বৃদ্ধি নয় তা বোঝা যাবে যে ১৯৪১ থেকে ১৯৭১—এই ৩০ বছরে কোনও বৃদ্ধি নেই। আবার ১৯৭১ থেকে ২০১১ এই ৪০ বছরে মুসলমান সংখ্যা প্রায় ১০% বেড়ে ৩৪% দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ অসমের জনমানচিত্রে একটি ভয়ংকর পরিবর্তন এনেছে মুসলমান জনসংখ্যার বৃদ্ধি। এই জনসংখ্যাবৃদ্ধিতে বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ যে একটি মূল কারণ তা সবাই জানেন।

এজন্যই আশির দশকে শুরু হল দ্বিতীয় 'বঙ্গাল খেদা'। স্কুল-কলেজ, সাইনবোর্ড, সিনেমা হল, যাত্রাপালা থেকে বাংলা ও সরকারি বেসরকারি চাকরি থেকে বাঙালি হিন্দু হঠিয়ে বলীয়ান অসমিয়া সমাজ এবার দাবি তুললো 'বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী' বিতাড়নের। অর্থাৎ মুসলমান হঠাও। এবার কিন্তু ব্যাপারটা আগেরবারের মতো সহজ রইলো না। যত হম্বিতম্বি সব সরকারি অফিস ও তৈল শোধনাগার ঘেরাও আর লাগাতার বন্‌ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইলো। অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি মুসলমানদের হটানোর দায়িত্ব তারা সরকারের ওপর ছেড়ে দিলেন। এবং তারা (আন্দোলনকারীরা, আসু) সরকারে এলে কড়া পদক্ষেপ নেবেন বলে আওয়াজ তুললেন। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৫, এই ছ বছরের আন্দোলনের সমাপ্তি হল কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকারের সাথে অসম চুক্তি। যার জন্যই এই অসমে জাতীয় নাগরিকপঞ্জীর নবীকরণ চলছে।

পশ্চিমবঙ্গেও প্রয়োজন

আজকের পশ্চিমবঙ্গের মূল সমস্যা হল ইসলামি মৌলবাদ। শুধু ইসলামি দলগুলি কিছু সন্ত্রাস চালালে তা তেমন বিপজ্জনক হতো না। কিন্তু এখানে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার এখন ইসলামি মৌলবাদীদের হাতের পুতুল। সরকার, পুলিশ, বুদ্ধিজীবী, মিশন-সেবাশ্রম---সবাই ইসলামি মৌলবাদীদের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছে। আর অনুপ্রবেশ, পশ্চিমবঙ্গ তৈরির মূল কথা, হিন্দু জনসংখ্যার আধিপত্যকেই ধ্বংস করে দিয়েছে। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে, তাদের বিতাড়ন করেই একমাত্র নতুন পশ্চিমবঙ্গ গড়া যাবে। নইলে এর একমাত্র ভবিষ্যৎ পশ্চিম বাংলাদেশ হয়ে যাওয়া। অসমে অনুপ্রবেশ সমস্যা আরো বেশি। অসমের বিজেপি সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছে আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গে তা নিতেই হবে। এই দাবি এখনি তুলতে হবে। ■

এই সময়

পলাতক বেবুন

বেবুন বানর জাতির প্রাণী। প্যারিসের একটি অগ্রগণ্য চিড়িয়াখানা থেকে সম্প্রতি ৫০টি বেবুন দল বেঁধে পালায়। সবাইকে ফেরানো

গেলেও এখন পর্যন্ত এক প্রৌঢ়া, এক যুবতী এবং এক শিশু নিখোঁজ। চিড়িয়াখানার কৃত্রিম পাহাড়ি গুহা থেকে ওরা কীভাবে পালাল তাই নিয়ে কর্তৃপক্ষ ধন্দে।

ছবির বদলে

হোয়াইট হাউসের দেওয়াল সাজানোর জন্য ভ্যান গঘের ছবি চেয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তাঁর কন্যা। গুগেনহেম জাদুঘর কর্তৃপক্ষ

সবিনয়ে জানিয়েছেন, ছবি দেওয়া সম্ভব নয়। পরিবর্তে তারা ১৮ ক্যারেট সোনার তৈরি কমোট প্যান পাঠিয়েছেন।

অ্যাপের বিপদ

প্রায় অন্ধের মতো জিপিএস অ্যাপের নির্দেশ অনুসরণ করে গাড়ি চালাচ্ছিলেন এক যুবক।

সঙ্গী দুজন বন্ধু। ভুল রাস্তায় চলে এসেছেন খেয়াল করেননি কেউ। হুঁশ ফিরল গাড়িটি লেকের কনকনে ঠাণ্ডা জলে তলিয়ে যাবার পর। তবে বড়সড় কোনও বিপদ ঘটেনি।

সমাবেশ -সমাচার

কলকাতায় পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন

গত ২৪ জানুয়ারি কলকাতার কলামন্দিরের কলাকুঞ্জ সভাগারে যোগক্ষেম, শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয় এবং দীনদয়াল রিসার্চ ইন্সটিটিউশনের উদ্যোগে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল তথাগত রায়। প্রধান অতিথিরূপে ছিলেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস। প্রধানবক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ সুরেশ যোশী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দীনদয়াল রিসার্চ ইন্সটিটিউশনের সম্পাদক অতুল জৈন। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের ড. প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী। ড. বিশ্বাস তাঁর বক্তব্যে সাংস্কৃতিক

রাষ্ট্রবাদের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করেন। মুখ্য বক্তা শ্রীযোশী বলেন, শাশ্বত ভারতীয় জীবন দর্শনই হলো পণ্ডিত দীনদয়ালের একাত্ম মানবদর্শন। তা কোনও ব্যক্তি, জাতি বা দলের নয়, তা সমগ্র মানব জাতির এবং সমৃদ্ধ ভারত নির্মাণের মূলমন্ত্র।

সভায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন খড়্গপুর আই আই টি-র অধ্যাপক পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায়।

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের প্রদেশ কার্যকারী সমিতির বৈঠক

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ, উচ্চশিক্ষা, পশ্চিমবঙ্গ অধ্যাপকদের প্রাদেশিক কর্ম সমিতির বৈঠক গত ২১ জানুয়ারি হাওড়া জেলার তাঁতিবেড়িয়া সারদা শিশু মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতা, গৌড়বঙ্গ, সিধু-কানু-বিরসা, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাঁকুড়া, বিদ্যাসাগর, বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সাইন্স ইউনিভার্সিটি, ওয়েষ্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অব অ্যানিমাল সাইন্সেস অ্যান্ড ফিশারিজ, ওয়স্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটি প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে বিশেষভাবে উ পস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের সংগঠন সম্পাদক মহেন্দ্র কাপুর।

বৈঠক শুরু হয় অধ্যাপক কৃষ্ণ সরকারের সরস্বতী বন্দনা দিয়ে। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বায়করা সদস্যতা অভিযান, বিগত তিনমাসের কার্যক্রম এবং আগামী কর্মপন্থা বিষয়ে প্রতিবেদন পাঠ করেন। বৈঠকের শেষলগ্নে দেশের সুরক্ষা বিষয়ে এক মনোজ্ঞ বক্তব্য রাখেন অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল কে কে গঙ্গোপাধ্যায়।

এই সময়

ডিম জমে হিম

শীতকালে জল জমে বরফ হওয়ার ঘটনা আকছার ঘটে। ডিম ফাটিয়ে সদ্য বের করা কুসুম

জমে বরফ হয়ে যাওয়ার ঘটনার কথা বড়ো একটা শোনা যায় না। ঘটনাটি ঘটেছে চীনে। শুধু ডিম নয়, সেখানে প্লেট থেকে নুডলস মুখে তোলার আগেই বরফ হয়ে যাচ্ছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

রক্ততৃষা

এমন ভয়ঙ্কর দৃশ্যও তা হলে দেখা যায়। ঘটনাটি ইন্দোনেশিয়ার। একটি অনুষ্ঠানে সে দেশের সেনাবাহিনীর কয়েকজন সদস্য বিষাক্ত সাপের

মাথা কেটে রক্তপান করে দর্শকদের আনন্দ দেন। সাপের মধ্যে ছিল গোখরো, কেউটে— এমনকী শঙ্খচূড়ও।

ভুল করার অধিকার

মানুষ মাত্রেই ভুল করে। কিন্তু ভুল করাকে

অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের চেষ্টা শুরু হয়েছে ফ্রান্সে। সে দেশের আইনপ্রণেতারা সাধারণ মানুষের ভুল করার অধিকারকে আইনি মান্যতা দেবার পক্ষে ভোট দিয়েছেন। আইন তৈরি হলে সরকারি কাজকর্মে বিশেষভাবে কার্যকর করা হবে।

সমাবেশ -সমাচার

সাহিত্যভূষণে সম্মানিত ড. প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী

কলকাতার প্রখ্যাত হিন্দি সাহিত্যিক তথা শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের সভাপতি ড প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠীকে গত ২৩ জানুয়ারি লক্ষ্ণৌয়ে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর

বাসভবনে উত্তরপ্রদেশ হিন্দি সংস্থানের পক্ষে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে সাহিত্যভূষণ সম্মানে ভূষিত করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ স্বয়ং হিন্দি সাহিত্য সেবার জন্য তাঁকে এই সম্মানে ভূষিত করেন। অনুষ্ঠানে বলদেবভাই শর্মা, ড. রামশরণ গৌড়, বেদপ্রকাশ অমিতাভ, শ্রীরাম পরিহার, অধ্যাপক সুরেন্দ্র দুবে, গণেশ নারায়ণ শুক্ল প্রমুখকেও সাহিত্যভূষণ সম্মানে ভূষিত করা হয়।

বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের প্রদেশ কার্যকারিণী বৈঠক

গত ২০ জানুয়ারি হাওড়া জেলার তাঁতিবেড়িয়া সারদা শিশু মন্দিরে বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের প্রাদেশিক কার্যকারিণী সমিতির বৈঠক ও কর্তব্যবোধ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। সারা দিনের বৈঠকে দক্ষিণ বঙ্গের ১৪টি জেলা থেকে ৫০ জন কার্যকর্তা

অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের সংগঠন সম্পাদক মহেন্দ্র কাপুর। উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের প্রাদেশিক সভাপতি সোমেন চন্দ্র দাস, সম্পাদক কানুপ্রিয় দাস ও সংগঠন সম্পাদক আলোক চট্টোপাধ্যায়।

এই সময়

উটসুন্দরী

ঠোঁটের মাংস ঝুলে গেলে বিশ্রী দেখায়। তাই শিথিল পেশি শক্ত করার ওষুধ বোটক্স ব্যবহার

করা হয়। সেই অপরাধে বিউটি কনটেস্ট থেকে বাদ পড়েছে বারোজন। না, কোনও মহিলা নন। বারোটি উট। ঘটনাস্থল সৌদি আরব।

জঙ্গি যুবতী

সারা দেশ যখন সাধারণতন্ত্র দিবসের উৎসবে শামিল ঠিক সেই সময় জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ আঠারো বছরের একটি মেয়েকে আটক করল।

মেয়েটি আই এস জঙ্গি শিবিরে যোগ দিতে যাচ্ছিল বলে অভিযোগ। ফার্মাসির ছাত্রী মেয়েটির নাম সাদিয়া আনোয়ার শেখ।

অটল পেনশন যোজনা

পেমেন্ট ব্যাঙ্ক এবং স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নতুন উদ্ভাবন। এখনও পর্যন্ত সারা দেশে ১১টি পেমেন্ট ব্যাঙ্ক এবং ১০টি স্মল

ফাইনান্স ব্যাঙ্ক তৈরি করা গেছে। দেশের ৮৩ লক্ষ অবসরপ্রাপ্তকে এই নতুন চেনের মাধ্যমে অটল পেনশন যোজনার টাকা দেওয়া হবে বলে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে জানানো হয়েছে।

সমাবেশ -সমাচার

পুরুলিয়ায় কর্তব্যবোধ দিবসে শিক্ষকদের শ্রদ্ধার্ঘ্য

গত ১২ জানুয়ারি পুরুলিয়া শহরে বঙ্গীয় নবউন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘ, বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘ এবং জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সঙ্ঘের মিলিত উদ্যোগে আদ্রানগর সেবা ভারতীর কার্যালয়ে স্বামীজীর জন্মদিনে সাড়ম্বরে পালিত হয় কর্তব্যবোধ দিবস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের রাজ্য সভাপতি অবনীভূষণ মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন বিভাগ সঙ্ঘচালক অসিত দে এবং পুরুলিয়া জেলার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ জেলা কার্যবাহ রাজেন মাহাত। বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের পুরুলিয়া জেলা সভাপতি বিবেকানন্দ চ্যাটার্জী স্বাগত বক্তব্য রাখেন। রাজ্য সভাপতি অবনীভূষণ মণ্ডল তাঁর বক্তব্যে স্বামীজীর বৈভবশালী ভারত নির্মাণকে সার্থক করে তোলার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বঙ্গীয় নবউন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের পুরুলিয়া জেলার সভাপতি পার্থ গঙ্গোপাধ্যায়।

‘শ্রদ্ধা’র অষ্টম বার্ষিক অনুভবী সম্মেলন

গত ১৪ জানুয়ারি বীরভূম জেলার সিউড়ী শহরে শ্রদ্ধার অষ্টম বার্ষিক অনুভবী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় । শঙ্খধ্বনি, ওঙ্কার ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে বৈঠকের সূচনা করেন শ্রদ্ধার সভাপতি মহাদেব মুখোপাধ্যায় এবং অতিথিদ্বয় ড. রণজিৎ বাগ ও ড. মহাদেব দে। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী কাকলী দাস । শ্রদ্ধার সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠ করেন। আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ দে। শ্রীমতী রুপালি ঘোষাল এবং কবি ও গীতিকার রতন কাহার স্বরচিত গীত পরিবেশন করেন। শ্রদ্ধার ওপর একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন গোপীজন বল্লভ পদরেণু ঘোষ। সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন শ্রীমতী চৈতালী মিশ্র। দুটি ভজন পরিবেশন করেন শ্রীমতী বর্ণালী চৌধুরী। সমাপ্তি বক্তব্য রাখেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শিক্ষক পতিতপাবন বৈরাগ্য।

উত্তরবঙ্গ সেবা ভারতীর উদ্যোগে স্কুলছাত্রদের সামগ্রী প্রদান

গত ১২ জানুয়ারি উত্তরবঙ্গ সেবা ভারতীর উদ্যোগে শিলিগুড়ি শহরের বীর চিলা রায় উপনগরে ৭০ জন দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীকে স্কুলব্যাগ, খাতা, টিফিন বক্স দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সামাজিক সমরসতা প্রমুখ দিলীপ ভকত, সেবা ভারতীর সভাপতি মহেন্দ্র রাম, সঙ্ঘের জেলা শারীরিক প্রমুখ দীপক রায়।

ভারতের সংবিধান সকলের আস্থা এবং বিশ্বাসের প্রতীক

অতিথি কলম

রবিশঙ্কর প্রসাদ

ভারতীয় সংবিধান এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ভারতের গণতন্ত্রকে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ করেছে। সংবিধান-সৃষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান হলো ভারতের নির্বাচন কমিশন যা ভারতীয় গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে তোলার কাজে দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সংবিধান প্রণেতারা পক্ষপাতহীন এবং ফলপ্রসূ ভোটাধিকারের প্রয়োজনীয়তার কথা অনুভব করেছিলেন। যার জন্য প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের অবাধ ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়েছিল। গণভোটের ভাবনা থেকেই জন্ম নিয়েছিল একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠার ভাবনা। সঙ্গত কারণেই প্রতিষ্ঠানটি পেয়েছিল স্বয়ংশাসিত হবার অধিকার।

ভারতের মতো দেশে প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামোর মধ্যে থেকে নির্বাচন পরিচালনা করা সহজ কথা নয়। ভারতীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এমন সময়ও ছিল যখন নির্বাচনী প্রক্রিয়া বুথ দখল এবং জোর করে ভোট দিতে না দেওয়ার ঘটনায় বাধাপ্রাপ্ত হতো। তখনকার তুলনায় এখন নির্বাচনী ব্যবস্থা যথেষ্ট পরিণত। আজকাল বুথ দখল বা ছাপ্পা ভোটের কথা বিশেষ শোনা যায় না। গত কয়েক বছরে নির্বাচনে প্রযুক্তির ব্যবহার অনেকাংশে বেড়েছে, যার ফল অবাধ ও স্বচ্ছ নির্বাচন।

ভারতের সাংবিধানিক এবং রাজনৈতিক যাত্রার বিবর্তনে আরও অন্তত দুটি প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। আমাদের বিচারব্যবস্থা যে মৌলিক ভূমিকা পালন করেছে তার জন্য আমরা গর্বিত। বিশেষ করে সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারের ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে। গত সত্তর বছরে জাতি ধর্ম অঞ্চল এবং অধিকারের সীমা সংক্রান্ত নানা জটিল বিষয় বিচারব্যবস্থার সামনে উত্থাপিত হয়েছে। তাদের মধ্যে বেশ কিছু বিষয় চুলচেরা বিশ্লেষণের পর হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট যেসব মননশীল রায় দিয়েছে তা নিঃসন্দেহে ভারতীয় গণতন্ত্রের ক্রমিক উত্তরণের সহায়ক।

পিছিয়ে পড়া মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের সুরক্ষায় জনস্বার্থ মামলা ভারতীয় বিচারব্যবস্থার একটি অসামান্য অবদান। যেহেতু জনস্বার্থ মামলা একটি দারুণ বিকল্প তাই তার জন্য কিছু সাবধানতা

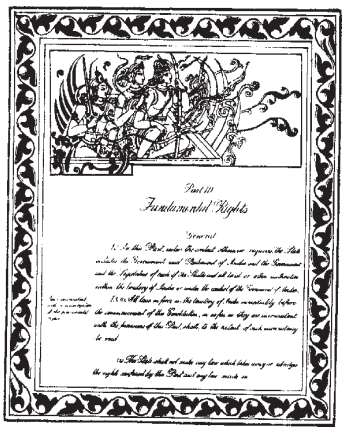
Part III
Fundamental Rights

অবলম্বনও সবিশেষ জরুরি। দেখা দরকার দরিদ্র এবং পিছিয়ে পড়া মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষিত রাখার জন্য যেন জনস্বার্থ মামলার অপব্যবহার না হয়। সুপ্রিম কোর্ট সাম্প্রতিককালে ভুল প্রয়োগের জন্য বেশ কয়েকটি জনস্বার্থ মামলা খারিজ করে দিয়েছে।

ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতারা চেয়েছিলেন, মানুষ যাদের শাসক হিসেবে নির্বাচিত করেছে এবং যারা দেশের মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ, ভারতের শাসনভার তাদেরই দেওয়া হোক। আইন প্রণয়ন সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। সরকার এবং দায়বদ্ধতা দুটি প্রায় সমোচ্চারিত শব্দ। দায়বদ্ধতা বলতে

> “আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী জাত, ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যেও ভারতকে সঙ্ঘবদ্ধ থাকতে হবে। হাজার হাজার বছর ধরে ভারত সেভাবেই থেকে এসেছে। আগামী দিনেও এক সুমহান ঐতিহ্য এবং আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে ভারত ক্রমশ এগিয়ে যাবে।”

সাধারণত সংসদ এবং মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা বোঝায়। বিখ্যাত কেশবানন্দ ভারতী মামলায় সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের মৌলিক কাঠামোটির ব্যাখ্যা দিয়েছে। যাতে বলা হয়, সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমেও এই মৌলিক কাঠামোটির পরিবর্তন সংসদ করতে পারবে না। সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ হলো গণতন্ত্র, আইনের শাসন এবং সাধারণতন্ত্রে বিশ্বাসী সরকার। ওই মামলায় রাজনৈতিক ক্ষমতাকে বিচ্ছিন্ন একটি বিষয় হিসেবে দেখার পক্ষে সওয়াল করে সুপ্রিম কোর্ট। স্বাধীন বিচারব্যবস্থা আমাদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞার একটি অঙ্গ। আমরা সকলেই বিচারব্যবস্থার প্রতি দায়বদ্ধ।

ভারতীয় গণতন্ত্রের বিবর্তনে সংবিধান-সৃষ্ট আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের নাম মিডিয়া। প্রায়শই বলা হয় ভারতে খবরের অভাব নেই। ভারতের মানুষও খবরপ্রিয়। এখন ভারতে টিভি চ্যানেলের সংখ্যা ৮৮২, যার মধ্যে ২০০টি খবরের চ্যানেল। এদের মধ্যে আবার বেশ কয়েকটি চব্বিশ ঘণ্টার চ্যানেল। সারা দেশে ৯৯,৬৬০টি সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়। এদের মধ্যে কয়েকটি সরকারের তীব্র সমালোচক। আবার কয়েকটি সরকারকে উপদেশ বা পরামর্শ দেয়। সরকার ভুল করলে সতর্ক করে। কখনও কখনও সরকারি সিদ্ধান্ত ও তার প্রয়োগকে আরও উন্নত করার কাজে সহায়তা করে। তাৎক্ষণিক খবরের ক্ষেত্রে টিভি মিডিয়া দেশের সম্পদ। সারা দেশে মিডিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত। কিন্তু এটাও সত্যি, মিডিয়ার একাংশ ভুল অসত্য বা কৃত্রিম খবর দিয়ে অনেক সময়েই সত্যের অপলাপ ঘটায়। তবে আমরা বিশ্বাস করি, সংবিধান-সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির সেই শক্তি রয়েছে যার দ্বারা এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। সর্বোপরি রয়েছেন মানুষ যাদের কাছে সত্য বেশিদিন গোপন থাকে না।

আমাদের গণতান্ত্রিক পরিকাঠামো সেই পরিসর সৃষ্টিতে সক্ষম যা একটি বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে সহযোগিতামূলক সক্রিয়তা প্রদান করে। সেই সঙ্গে নাগরিক সমাজের উন্নতির কথাও বলা দরকার। বস্তুত প্রগতিশীল নাগরিক সমাজের জন্যই ভারতের গণতন্ত্র এমন সুদূরপ্রসারী হতে পেরেছে। নাগরিক সমাজের সক্রিয়তায় সাম্প্রতিককালে তথ্য জানার অধিকার এবং বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষালাভের মতো দুটি বিষয় বাস্তবায়িত হয়েছে।

গত সত্তর বছরে ভারত বহুবার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। এইসব চ্যালেঞ্জের মধ্যে যেমন রয়েছে কোটি কোটি ভারতীয়কে দারিদ্র্যের কবল থেকে মুক্ত করে তাদের স্বাস্থ্যসুরক্ষা এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করা, তেমনই রয়েছে ধর্মীয় মৌলবাদ এবং মাওবাদের মতো চ্যালেঞ্জ। যদিও শান্তি বজায় রাখার ব্যাপারে ভারতীয়দের সদিচ্ছা আমাদের সম্পদ। যারা বন্দুকের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলে বিশ্বাসী, আমাদের সৌভাগ্য, তারা এখনও রাজনীতির ময়দানে তেমন পরিসর পাননি। মৌলবাদী সংগঠনগুলির আজও নির্বাচনে লড়ার বা মানুষের কাছে বিচার চাইবার সাহস নেই। দু-একটি সংগঠন চেষ্টা করেছিল বটে কিন্তু মানুষ তাদের কথা শোনেননি।

আজকাল সন্ত্রাসবাদ উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে বেশ বড়োসড়ো বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরল সাধারণ মানুষের হত্যা কোনও যুক্তিতেই সমর্থন করা যায় না। যদিও আমাদের প্রতিবেশী কয়েকটি দেশ এখনও সন্ত্রাসবাদকে তাদের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম অঙ্গ হিসেবে ব্যবহার করে চলেছে। রাষ্ট্রের দ্বারা পুষ্ট সন্ত্রাসবাদের ক্ষেত্রে আমাদের কোনওরকম শৈথিল্য দেখালে চলবে না। সন্ত্রাসের মদতদাতা, সংগঠক, অর্থের জোগানদার প্রত্যেককে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে।

১৯৭৫ সালে ভারতীয় গণতন্ত্র সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল। সে বছর সারা দেশে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়। কারণ দেশের একটি হাইকোর্ট তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীকে নির্বাচনী বিধিভঙ্গের দায়ে দায়ী করেছিল। বাকস্বাধীনতা বলতে তখন কিছুই ছিল না। মিডিয়ার স্বাধীনতাও কাটছাঁট করা হয়। বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আমি তখন ছাত্রনেতা। গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের অব্যবহিত পরেই সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এবং ভারতীয় জনগণ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীকে পরাস্ত করে নতুন সরকারের পত্তন করেন। জরুরি অবস্থার সবথেকে বড়ো শিক্ষা হলো, এখনকার কোনও নেতা বা রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রকে বিকৃত করার কথা ভাবতেই পারে না।

ভারতীয় গণতন্ত্রের একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে। সেই ছাত্র রাজনীতি করার সময় থেকে শুরু করে আমার তিরিশ বছরের রাজনৈতিক জীবনে, আমি সেই সৌন্দর্য তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছি। মানুষের অভাব-অভিযোগ কে কতটা তুলে ধরতে পারবেন— তার ওপর ভিত্তি করেই ভারতীয়রা তাদের রাজনৈতিক মতামত ব্যক্ত করেন। সেই সঙ্গে তারা এটাও আশা করেন, যাদের তাঁরা সংসদে বা বিধানসভায় পাঠালেন তারা তাদের আচারে ব্যবহারে ন্যূনতম রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দেবেন এবং ভারতীয়ত্বের ধারণাটিকে পরিপুষ্ট করবেন। যারা মানুষের এই প্রত্যাশার সঙ্গে তাল মেলাতে সক্ষম হননি তারা বেশিদিন রাজনীতিতে থাকতেও পারেননি।

গণতন্ত্রে বিতর্ক থাকবেই। উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ও হতে পারে। রাস্তাঘাটে মারামারি হওয়াও অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু এইসব চিৎকার- চেঁচামেচির মধ্যে বাস করেও ভারতীয়রা জানেন আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী জাত, ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যেও ভারতকে সঙ্ঘবদ্ধ থাকতে হবে। হাজার হাজার বছর ধরে ভারত সেভাবেই থেকে এসেছে। আগামী দিনেও এক সুমহান ঐতিহ্য এবং আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে ভারত ক্রমশ এগিয়ে যাবে।

(লেখক কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী)

চিঠিপত্র

ধিক্কার জানাই

স্বস্তিকা পত্রিকায় ২৫/১২/১৭ তারিখের সংখ্যায় শ্রীমতী মণিকা মুখার্জির পত্র 'আওরঙ্গজেব পিতৃহন্তারক হতে পারেন না'—শীর্ষক চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে এই চিঠি।

ইংরেজরা ভারতের ইতিহাসে নিজস্বার্থে অনেক মিথ্যে কথা ঢুকিয়েছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সেই ইতিহাসকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন..."অয়ি ইতিবৃত্ত কথা! ক্ষান্ত কর মুখর ভাষণ! ওগো মিথ্যাময়ী। তোমার লিখন পরে বিধাতার অব্যর্থ লিখন হবে আজি জয়ী" (শিবাজী উৎসব)। কিন্তু এহেন ইংরেজ আমলের ইতিহাসেও আওরঙ্গজেবের নিষ্ঠুরতার কথা, বাপকে জেলে পুরে, ভাইদের মেরে রাজ্য দখল করার কথা লেখা আছে। আজ আমরা তিন-চার পুরুষ ধরে সেই ইতিহাস পড়ে আসছি। আর ইনি আমাদের নতুন কথা শোনাচ্ছেন। ইনি কি তাহলে স্যার যদুনাথ সরকার, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং পি.এন.ওক প্রমুখ ঐতিহাসিকের চেয়েও পণ্ডিত? না ভারতের ইতিহাসকে যারা বিকৃত করেছে সেই বামপন্থী ঐতিহাসিকদের বিষাক্ত চক্রের দীক্ষাপ্রাপ্তা একজন?

প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

পাটুলি, কলকাতা-৯৪

হিন্দুরা কখনও অন্যের দেশ দখল করেনি

স্বস্তিকা পত্রিকার ২৫ ডিসেম্বরের সংখ্যায় চিঠিপত্র বিভাগে মণিকা মুখার্জির লেখা 'ঔরঙ্গজেব পিতৃহন্তারক হতে পারেন না' পড়ে অবাক হয়েছি। কারণ যে ইতিহাস আমরা এতদিন ধরে জানতাম এটা তার থেকে অন্যরকম। ঐ প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে একটা জিনিস বলতে চাই—পাকিস্তানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইতিহাসের পাঠ্য বইয়ে ঔরঙ্গজেবকে বীর নায়ক হিসেবে দেখানো হয়েছে। বাংলাদেশেও এক শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ওই একই ইতিহাস পড়ানো হয়। ঔরঙ্গজেব ছিলেন চরম পরধর্ম অসহিষ্ণু এক চরিত্র। বিধর্মীদের ধর্মস্থান ধ্বংস, খুন, নানা ভাবে সীমাহীন নির্যাতন ছিল তার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই তিনি পাকিস্তান ও বাংলাদেশে বীর নায়ক। পক্ষান্তরে আকবর এদের কাছে খলনায়ক, কারণ তিনি হিন্দুদের সঙ্গে 'সমঝোতা নীতি' অবলম্বন করে শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন। এই ধরনের ইতিহাস থেকে লেখিকা প্রভাবিত হয়েছেন বলেই মনে হয়। সিংহাসন নিষ্কণ্টক করার জন্য অওরঙ্গজেব তার তিন ভাই দারা, সুজা, মুরাদকে হত্যা ও পিতা শাহজাহানকে বন্দি করেন। অন্ধকার কুঠুরিতেই শাহজাহানের মৃত্যু হয়। এটা ইতিহাস থেকে জানা যায়। লেখিকা যুক্তির সমর্থনে কোনও বই বা পত্রিকার উল্লেখ করেননি। শুধু এইটুকু বলবো হিন্দুরা মুসলিম বিরোধী হলে শক, হুণ, পাঠান, মোগলরা দীর্ঘ ছয়শো বছর ভারতবর্ষ শাসন করে নিদর্শন রাখতে পারত না। ভারতের অংশ ভাগ করে তাদের দেশ হল। কোনও হিন্দু কিন্তু অন্যের দেশ দখল করেনি।

অজয় বিশ্বাস,

পাটুলি, কলকাতা-৯৪

সরস্বতী পূজার দিন প্রেমদিবস নয়

কয়েক বৎসর ধরে লক্ষ্য করছি দেবী সরস্বতীর আরাধনার দিনটিকে এই রাজ্যের কিছু জ্ঞানীগুণী মানুষ আর মিডিয়া মিলে কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীদের খুল্লামখুল্লা প্রেমদিবস রূপে তুলে ধরতে মরিয়া। সরস্বতী পূজার তাৎপর্য কী তাই?

হিন্দুর প্রধান দেবীগণের মধ্যে সরস্বতী অন্যতমা। জ্ঞান, বিজ্ঞান, ললিতকলা প্রভৃতি বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীশ্রী সরস্বতী। তাই ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক, নৃত্য, সঙ্গীত ও চিত্রকলার সাধকদের কাছে দেবী সরস্বতীর আরাধনার দিনটা বিশেষ মাত্রা পায়। বৈদিক শাস্ত্রে দেবী সরস্বতী নদীরূপা, যজ্ঞাগ্নি রূপা, জ্যোতিরূপা। সেখানে তিনি অন্নদানকারিণী, শক্তিরূপিণী, আরোগ্যকারিণী। এই দেবীই ক্রমে বিবর্তিত হয়ে বর্তমানে জ্ঞান, বিদ্যা ও কলার অধিষ্ঠাত্রী রূপে বিশেষ ভাবে পূজিতা। সরস্বতী নদীর তীরেই বৈদিক সভ্যতার বিকাশ। তার তীরেই শত-সহস্র মুনি-ঋষির তপস্যাতেই বেদ-উপনিষদের জ্ঞান উদ্ভাসিত হয়েছে। সে কারণেই হয়তো এই বিশেষত্ব। যজ্ঞকে যদি চিন্তন-মন্থন-রূপ তপস্যা ধরি তবে যজ্ঞাগ্নি তা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানালোক। আর জ্ঞানকে তো জ্যোতি রূপে কল্পনা করা হয়েছে। ''তমোসো মা জ্যোতির্গময়''। তাই জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী জ্যোতিরূপা। তবে বৈদিক শাস্ত্রে এই দেবীর গুণকর্মের বিবরণ থাকলেও শরীরী অবয়বের কোনও বর্ণনা পাওয়া যায় না। শুধু জানা যায় তিনি শুভ্রবর্ণা। ঐতেরেয় ব্রাহ্মণে তার নারী রূপের অস্পষ্ট কল্পনার আভাস পাওয়া যায়।

দশম শতাব্দীর পরের বিভিন্ন পুরাণ, তন্ত্রগ্রন্থ এবং বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থে এই দেবীকে বিবিধ রূপে উপস্থিত করা হয়েছে। সে সব পার করে যে রূপে পাচ্ছি, তা হল দেবী চতুর্ভুজা বা দ্বিভুজা, শ্বেতবর্ণা, শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা, শ্বেত মুক্তমাল্য শোভিতা। তিনি শ্বেতপদ্মাসনা, তাঁর হাতে পুস্তক, বীণা, অক্ষমালা ও বরমুদ্রা। দেবীর অপর সকল অলঙ্কারও শুভ্রবর্ণের। দেবী হংসবাহনা। দেবী বাকদেবী, বাগেশ্বরী, বীণাপাণি, শারদা প্রভৃতি নানা নামে সমাদৃতা। দেবীর এই রূপবর্ণনার মধ্যেই সূত্রাকারে নিহিত আছে বিদ্যা ও জ্ঞানের সাধনার পথ।

পদ্ম কুলকুণ্ডলিনীচক্রের সহস্রারের প্রতীক। এই সহস্রারেই জ্ঞানময় চৈতন্যসত্তার অবস্থান। তাই জ্ঞান ও বিদ্যার দেবী পদ্মাসনা। সূর্যজ্যোতির সাদা রঙের মধ্যে সকল রং সমানভাবে বিদ্যমান থেকে

সকল বস্তুকে নিজ নিজ নিজস্বতায় ফুটিয়ে তোলে। সূর্যকিরণ এমন না হয়ে বিশেষ রঙের হলে তা কখনই হতো না। জ্ঞানও তো তাই; নির্মল স্বচ্ছ জ্ঞানই জগৎকে প্রকৃত রূপে সমৃদ্ধ করতে পারে। তাই দেবীর শ্বেতপদ্মরূপ নির্মল চৈতন্য সত্তায় বিরাজিতা। দেবীর গাত্রবর্ণ, বস্ত্র ও অলঙ্কার বর্ণও নির্মলতার প্রতীক। হাত কর্মেন্দ্রিয়। হাতে পুস্তক, বীণা, অক্ষমালা জ্ঞান, শিল্প, তপস্যা এবং বরমুদ্রা তার সুফলের বার্তা। সেই সাথে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভের পথের ইঙ্গিত। দেবীর বাহন হংস, হাঁস নয়। হংস শব্দের এক অর্থ সূর্য। সূর্যরশ্মিই জীবন ও মেধার উৎস। তাছাড়া কথিত আছে সূর্য হতে বেদ বা জ্ঞানকে দোহন করা হয়েছিল, হংসরূপ সূর্য তাঁর বাহন। হংসের অপর অর্থ জ্ঞান (অহং স্ব), (পরমহংস মহাজ্ঞানী)। বাহন অর্থে যে বহন করে। প্রকৃতপক্ষে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শিক্ষা, বিদ্যা, জ্ঞান ও বুদ্ধিই আমাদের বহন করে নিয়ে চলে। তাই এসবই জ্ঞানদেবীর বাহন। বিদ্যা দেবীর এই রূপ বিদ্যার্থীর জন্য শিক্ষণীয় বার্তা। আমাদের সনাতন রীতির ব্রহ্মচর্যাশ্রমের চিত্র থেকে উঠে আসে নির্মল আদর্শ মানুষ নির্মাণের জন্য ছাত্রজীবন কেমন হওয়া উচিত। বিদ্যার্থী জীবনে প্রবেশের প্রথম প্রার্থনা—হে ভগবান, তুমি আমায় সেই মেধা প্রদান কর যাতে আমি তোমার সর্বব্যাপিতা উপলব্ধি করতে পারি। সারা জীবনের প্রার্থনাও এটাই। ভাবুন তো, যে, এই জগতের সকল বস্তুতে, সকল জীবে সেই এক ভগবানকে উপলব্ধি করা শিখবে, সে কেমন মানুষ হবে। পরিয়ে দেওয়া হয় ন'টি সূত্রের উপবীত। উপবীত মানে উপবস্ত্র। বস্ত্র আমাদের আচ্ছাদিত করে মার্জিত ও সুন্দর করে তোলে, উপবস্ত্র আমাদের চরিত্র আর আচরণকে মার্জিত ও সুন্দর করার জন্য। উপবীতের ৯টি সূত্র তার সদাচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপস্যা ও দানশীলতা এই নয় গুণের প্রতীক। তা পরিয়ে দেওয়ার অর্থ হল, এই গুণগুলো তুমি তোমার চরিত্র ও আচরণে ধারণ করলে, এই গুণ তোমাকে সুন্দর মানুষ করে তুলবে। এই জীবনে কাম, ক্রোধাদি রিপু দমন করে সরলতা, সদাচার, নিয়মনিষ্ঠা, সংযম, ভক্তি ও সরল-সহজ জীবনযাপনের অভ্যাস গড়ে তোলা হতো। অহঙ্কার চূর্ণ করতে ও নমনীয় হতে ভিক্ষা করতে হতো। শ্রদ্ধা, ভক্তি ও নিষ্ঠা ছিল জ্ঞানার্জনের ভিত্তি। ছাত্রজীবনে উশৃঙ্খলা আর প্রেম প্রেম খেলা নয়, এই আচরণেরই শিক্ষা প্রয়োজন। বিদ্যার দেবীর আরাধনার এটাই পথ। অন্য কোনও ভাবনা নয়।

প্রীতীশ তালুকদার
আমতলা, মুর্শিদাবাদ

একেই বলে আচ্ছে দিন

কংগ্রেসের সভাপতি রাহুল গান্ধী মন্দিরে মন্দিরে প্রার্থনা করছেন। প্রেস কনফারেন্স করে বলছেন আমার পরিবার শিবভক্ত। সাধুসন্তদের চেয়েও বড় তিলক কেটে ভোটের প্রচার সারছেন। আপাতদৃষ্টিতে বড়ো নিরীহ ব্যাপার। কিন্তু পিছনে রয়েছে হিন্দু সমাজের সামূহিক পরিবর্তন। বিজেপি বিরোধীরা নিজেদের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ বলে পরিচয় দেয়। মুসলিম ভোটব্যাঙ্কের দিকে তাকিয়ে তাদের মুসলিম প্রীতি। সেই ভোটব্যাঙ্কের পরোয়া না করে তারা হিন্দু মন্দিরে যাচ্ছেন। এর পিছনে একটিই কারণ।

বিভিন্ন রাজ্যে হারের কারণ জানতে এ কে অ্যান্টনির নেতৃত্ব কমিটি গঠন করে কংগ্রেস। অ্যান্টনি কমিটি যে রিপোর্ট দেয় তার সার মর্ম হচ্ছে কংগ্রেস যাকে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি বলছে হিন্দুরা তাকেই তুষ্টিকরণ বলে অভিহিত করছে। কংগ্রেসের সভাপতি প্রথমে একে আমল দেননি। কিন্তু গুজরাট নির্বাচনে তিনি এই রিপোর্টকে গুরুত্ব দেন। ২৬টি মন্দিরে তিনি পূজা দেন। প্রেস কনফারেন্স করে বলেন, আমার পরিবার শিবভক্ত। কোনও মসজিদে তিনি যাননি। তুষ্টিকরণের কোনও কথা বলেননি। সামনে কর্ণাটক নির্বাচন। শৃঙ্গেরী মঠ থেকে নির্বাচনী প্রচার শুরু করবেন। আরও কী করেন দেখার বিষয়।

কর্ণাটকের রাজনীতি সরগরম। ২২জন স্বয়ংসেবক ও বিজেপি কর্মী পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়ার হাতে নিহত হয়েছেন। এহেন পপুলার ফ্রন্টের সঙ্গে কংগ্রেসের যোগাযোগ সামনে এসেছে। কর্ণাটক তাই উত্তাল। তাই কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী এখন হিন্দুত্বে ফিরে এলেন পায়ের তলার মাটি খুঁজে পেতে। তিনি বলেছেন, আমার নামের সঙ্গে রাম ও মিদ্দা দুইই আছে। আমি রামভক্ত। ভূতের মুখে রাম নাম! কংগ্রেসের এক প্রবক্তা বলেছেন, রামমন্দিরের দরজা তো আমরাই খুলে দিয়েছি, তাইতো সেখানে হিন্দুরা পূজা করতে পারছে। মন্দির হবে এতে কোনও সংশয় নেই।

মুলায়ম সিংহ যাদব করসেবকদের উপর গুলি চালনার জন্য ক্ষমা চেয়েছেন। অখিলেশ যাদব নিজেকে কৃষ্ণের বংশধর বলে বিবৃতি দিয়েছেন। সমাজবাদী পার্টি বড় এক কৃষ্ণমূর্তি বানিয়েছে। তার উদ্বোধন হবে।

বীরভূমে ১৫ হাজার পুরোহিত নিয়ে সম্মেলন হলো। গেরুয়া পরে অনুব্রত মণ্ডল মঞ্চে উপস্থিত। এই সভায় উত্তরীয়, গীতা ও ৫০০ টাকা অনুদান দিয়েছেন।

আগরতলায় মানিক সরকার মন্দিরে যাচ্ছেন। পূজার অভিনন্দন বার্তা জারি করছেন। বামপন্থীরা দেশপ্রেমের কথা বলছে। এখন তারা ভগৎ সিংহ ও সূর্যসেনের কথা বলছে। সূর্যকান্ত মিশ্র স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তিতে মাল্যদান করেছেন। মানিক সরকার অনুকূল ঠাকুরের শিষ্যদের সম্মেলনে উপস্থিত থেকেছেন। পশ্চিম বাংলায় যে সিপিএম হিন্দু সমাজকে উঠতে বসতে গালি দিয়েছে, তারাই আজ মমতার মুসলিম প্রীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলছে।

এ পরিবর্তন অপ্রত্যাশিত। আসলে সারা ভারতে এখন হিন্দু জাগরণ ঘটেছে। সেই ঝড়ের মুখে পড়ে এই তথাকথিত সেকুলারবাদী রাজনৈতিক দলগুলিও বাধ্য হয়েই হিন্দু হৃদয় জয় করতে নামতে হয়েছে। একেই বোধহয় বলে আচ্ছে দিন।

নীতীন রায়
সোনারপুর, দঃ ২৪ পরগনা

ভিয়েতনামের ‘চম্পা’

সুপ্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল নিদর্শন

ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

হাজার হাজার বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী ভিয়েতনামের বালামন ও চম্ পৃথিবীর দুটি মাত্র অ-ভারতীয় অকৃত্রিম হিন্দু জনগোষ্ঠী। যা আজও টিকে আছে।

চম্ হিন্দুদের কথা খুব কম লোকই জানে। এরা মধ্য ভিয়েতনামের ‘চম্’ রাজবংশের উত্তরসূরী। এই রাজবংশ সপ্তম শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত রাজত্ব করেছিল। আজ এরা সংখ্যায় মাত্রই ষাট হাজারের কাছাকাছি। কিন্তু ভারত ভূখণ্ডের থেকে অনেকটা দূরে থাকা সত্ত্বেও এরা ভারতীয়ত্ব তথা হিন্দুত্বের মূল আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়নি। কয়েক শতাব্দী ধরে এরা এদের মূল সংস্কৃতি বহন করে চলেছে। ইন্দ্রপুরা, সিংহপুরা, অমরাবতী, বিজয়া এবং পাণ্ডুরঙ্গ নামের শহরগুলি তাদের নির্মাতাদের পরিচয় বহন করে চলেছে। যখন কেউ চম্পা জনগোষ্ঠীর কথা বলে, সে কথা শুধুই ইতিহাসের একটি ছেঁড়া পাতা নয়, সে কথা একটি জীবন্ত সংস্কৃতির, একটি পরম্পরার, যার শিকড় হাজার হাজার বছর আগে প্রোথিত হয়েছিল।

বর্তমানে ‘চম’-রা ভিয়েতনামের একমাত্র হিন্দু জনগোষ্ঠী যারা পৃথিবীর সবথেকে প্রাচীন ও মহান এই হিন্দু তথা ভারতীয় ঐতিহ্যের জন্য গর্ববোধ করে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে অসংখ্য হিন্দু রাজ্য ছিল। আজও তাদের আভিজাত্য ও কীর্তির স্বাক্ষর বহন করে চলেছে আঙ্কোরভাট থেকে প্রম্বন পর্যন্ত মহান স্থাপত্যগুলি।

চম্পা একটি নামকরা হিন্দু রাজ্য ছিল। তার ধনসম্পদ এবং পরিশীলিত সংস্কৃতি অতীতে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। এই রাজ্যের প্রধান বন্দর ছিল কাট্টিগাড়া। প্রায় দু’হাজার বছর আগে ক্লডিয়াস টলেমি (Claudius Ptolemy) কাট্টিগাড়ার সম্বন্ধে লেখেন এবং তাঁর স্বরচিত পৃথিবীর মানচিত্রে এই বন্দরটির স্থান নির্দেশ করেন। আধুনিক গবেষণা জানাচ্ছে যে সাইগনেরই পূর্বসূরী কাট্টিগাড়া, যে সাইগনের বর্তমান নাম হচ্ছে হো-চি-মিন সিটি। মেকং নদীমুখের প্রধান বন্দর ছিল এই কাট্টিগাড়া। মেকং নামটির উৎস হচ্ছে ‘মে নাম গং’ যার অর্থ হলো—‘The mother water Ganga’ (Mae Nam Khong)। এস স্বামীনাথন তাঁর বিখ্যাত রচনা ‘Ancient Sanskrit Inscriptions in strange places’-এ লিখেছেন, ‘প্রথম চম রাজা, ইতিহাস অনুযায়ী হচ্ছেন শ্রী মারান।’ তাঁকে একজন তামিল রাজা হিসাবেই সকলে জানত। বহু ইতিহাসবিদ কখনো লেখেননি যে একজন পাণ্ড্য রাজা একদা ভিয়েতনাম শাসন করতেন। তামিল ভাষায় একে বলা হয় থিরু মারান, এই নামে বহু পাণ্ড্য রাজার উল্লেখ পাওয়া যায় তামিল ‘সঙ্গম’ সাহিত্যে।

আরেকজন প্রাচীন চম্পা রাজা ছিলেন ভদ্রবর্মণ, যাঁর রাজত্বকাল ছিল ৩৪৯—৩৬১ খ্রিস্টাব্দ। তাঁর রাজধানী ছিল সিংহপুরা বা Lion City. এখন এর নাম হয়েছে ট্রা কিউ। ভদ্রবর্মণ বেশ কয়েকটি মন্দির নির্মাণ করান, দক্ষ প্রশাসক ছিলেন, জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করে ভারতে এসে গঙ্গার তীরে শেষ দিনগুলি কাটিয়ে দেহত্যাগ করেন।

ঐতিহাসিক স্থান চম্পা পাঁচটি ভাগে বিভক্ত ছিল। ইন্দ্রপুরা (বর্তমান নাম Dong Duong) ছিল রাজ্যের ধর্মীয় কেন্দ্রস্থল। অমরাবতী হচ্ছে বর্তমানের কুয়োং নাম (Quong Nam) প্রদেশ। বিজয়ার নাম এখন চা বান (Cha Ban)। কৌথারা বর্তমানে না ট্রাং (Nha Trang) এবং পাণ্ডুরঙ্গ বর্তমানে ফাং (Phan)। পাণ্ডুরঙ্গ ছিল শেষ চম্ রাজ্য যা পরবর্তীতে চীনা-ভিয়েতনামিদের দ্বারা অধিকৃত হয়।

অনেকেরই এই তথ্যটি জানেন যে ক্রিস্টোফার কলম্বাস তাঁর চতুর্থ এবং শেষ সমুদ্র অভিযানে চম্পা রাজ্যে পৌঁছবার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল যে তিনি ভিয়েতনামে পৌঁছেছেন। প্রাচীনকালে ইউরোপের সঙ্গে ভারতের নিয়মিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল, সমগ্র

দক্ষিণ এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ট্রেড রুট দিয়ে বাণিজ্য চলত। বহু শতাব্দী ধরে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পদ এবং মস্তিষ্ক-সম্পদ পৃথিবীর বিভিন্ন বাজারে ও প্রতিষ্ঠানে প্রবাহিত হয়ে গেছে। চতুর্দশ শতাব্দী নাগাদ রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ভারতের সঙ্গে পাশ্চাত্যের প্রত্যক্ষ বাণিজ্যিক সম্পর্ক ব্যাহত হয়েছিল।

কলম্বাস মনে করেছিলেন যে, স্পেন থেকে পশ্চিম অভিমুখে সমুদ্রাভিযান করলে তাঁর পৃথিবী পরিভ্রমণ করা হয়ে যাবে। একথা শুনে সেই সময় বেশিরভাগ ইউরোপীয়ান ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছিল, কারণ তারা তখনও মনে করত পৃথিবীটা চ্যাপটা, গোলাকার নয়। কলম্বাস মনে করেছিলেন যে একটি নতুন সমুদ্রপথ আবিষ্কার করে প্রাচ্যের সম্পদের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাবেন, দীর্ঘদিনের হারিয়ে যাওয়া পথটি আবার খুলে যাবে। তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন যে ভিয়েতনামের সমুদ্রতীর ধরে তিনি মালাক্কায় পৌঁছে যাবেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে ১২৯২ সালে মার্কো পোলো এই পথেই চীনদেশ থেকে ভারতে পৌঁছেছিলেন। কোস্টারিকায় পৌঁছে তাঁর মনে হয়েছিল যে তিনি ভিয়েতনামে এসে গেছেন এবং তাঁর বহু আকাঙ্ক্ষিত চম্পা রাজ্যের সোনার খনিগুলি তাঁর নাগালের মধ্যে এসে গেছে। ভিয়েতনামের সৌভাগ্য, তিনি ভুল ভেবেছিলেন।

প্রাচীনকালে চম্পা রাজারা বিশাল বিশাল মন্দির তৈরি করেছিলেন যার কিছু কিছু আজও দাঁড়িয়ে আছে। এই মন্দিরগুলির বেশিরভাগই চম্পা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ও রক্ষাকর্তা হিসাবে যাঁকে গণ্য করা হতো, সেই দেবাদিদেব মহাদেবের নামে উৎসর্গীকৃত। 'আমার পুত্র' (My son) নামের মন্দিরটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, যেটি এখন হিন্দুধর্ম ও দর্শনচর্চার কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত। প্রথমদিকে এই মন্দিরটিতে সত্তরটি দেবস্থান ছিল, এখন পঁচিশটি মাত্র অবশিষ্ট আছে। ১৯৬৯ সালে ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় প্রধান টাওয়ারটি আমেরিকান বোমার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 'আমার পুত্র' শিবলিঙ্গেরই পূজা হতো, যার আকৃতিকে শিবঠাকুরের আশীর্বাদপুষ্ট রাজার স্বর্গীয় ক্ষমতারই প্রতিবিম্ব মনে করা হতো। বর্তমানকালে চম জনগোষ্ঠী শিবঠাকুরের এই রূপকেই পূজা করেন।

ভিয়েতনামে বহু ঐতিহাসিক মূল্যবিশিষ্ট জিনিসপত্র পাওয়া গেছে। ২০০১ সালে ৩২০টি সোনার ফলক পাওয়া যায়। নানা প্রকার হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি দ্বারা ওই ফলকগুলি অলঙ্কৃত— যেমন গরুড়, নরসিংহ, কূর্ম ও দুর্গা। এই ফলকগুলি দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় পাওয়া সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হিন্দুধর্মের নিদর্শন হিসাবে পরিগণিত।

১৯৪০ সালের পর থেকেই খননকার্যের ফলে অনেক শিল্প নিদর্শন পাওয়া গেছে যা OcEo সংস্কৃতির প্রতিভূ। মূর্তি ও ছবিগুলিতে বুদ্ধ, গণেশ, বিষ্ণু, দুর্গা ও শিবের প্রতিকৃতি দেখতে পাওয়া যায়। এখানে শিবমূর্তি ও শিবলিঙ্গ উভয়ই আছে।

বহু ভিয়েতনামি হিন্দু শিল্প-নিদর্শন বৌদ্ধধর্মের চিহ্ন হিসাবে ভুল করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, বিয়েন হোয়া বিষ্ণুর উল্লেখ করা যায় যেটিতে বিষ্ণুর সকল চিহ্নই রয়েছে এবং যার পিছনদিকে সংস্কৃত ভাষায় বিষ্ণুর বর্ণনা রয়েছে। এই ভাস্কর্যটি ১০০ খ্রিস্টাব্দে, প্রিন্স বিজয় ক্লন নাউক চম্পা চেনলা বিজয়ের পরে ভগবান বিষ্ণুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার জন্য তৈরি করিয়েছিলেন। মাত্র ১০০ বছর আগে এই অসাধারণ শিল্পকর্মটি আবিষ্কৃত হয়।

পঞ্চম কোয়াং নাম হেরিটেজ ফেস্টিভ্যালে (২০১৩ সালের ২১শে জুন অনুষ্ঠিত) একটি বিষ্ণুমূর্তি প্রদর্শিত হয় যেটি ৩৫০০ থেকে ৪০০০ বছরের পুরনো। যদি এর সময় নিরূপণটি সঠিক হয় তাহলে মানতে হবে যে এই ভাস্কর্যটি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হিন্দু শিল্পকর্ম। চম লিপি দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মিক গ্রন্থলিপি থেকে উদ্ভূত। বর্তমানে সমগ্র পূর্ব এশিয়ায় চম জনগোষ্ঠী ছড়িয়ে পড়েছে। কম্বোডিয়াতে তারা বেশিরভাগই সুন্নি মুসলিম, চীনদেশে তারা শিয়া মুসলিম, থাইল্যান্ডে তারা বৌদ্ধ। ভিয়েতনামি চম্‌দের মধ্যে কিছু মুসলিম, কিছু মহাযানী বৌদ্ধ হলেও তাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠই হচ্ছে হিন্দু। তাদের বলা হয় বালামন (ব্রাহ্মণ) জনগোষ্ঠী। বলা হয়ে থাকে যে বালামনদের শতকরা সত্তর ভাগ ক্ষত্রিয়।

চম বালামনরা তাদের রাজত্ব হারিয়েছে, ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের শিকার হয়েছে, ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার খেয়েছে, কমিউনিস্ট শাসকদের অত্যাচার সয়েছে, তবু তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। তাদের মন্দিরগুলি আজও দাঁড়িয়ে আছে, তাদের উৎসবগুলি আজও উদ্‌যাপিত হচ্ছে এবং ঐতিহ্যময় হিন্দু সংস্কৃতি আজও সেখানে নিজ-অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। বালীর হিন্দুদের মত চম্ বালামন জনগোষ্ঠীও পৃথিবীর একমাত্র অ-ভারতীয় হিন্দু হিসাবে টিকে রয়েছে। তবে দুঃখের বিষয় যে, বর্তমান প্রজন্মের চম হিন্দু ছেলেমেয়েরা নিজেদের বৈষয়িক উন্নতির ব্যাপারে যতটা তৎপর, তাদের হিন্দু ঐতিহ্য, সংস্কৃতি রক্ষার ব্যাপারে ততটা তৎপর নয়।

ভারতের হিন্দুদের মতই ভিয়েতনামের হিন্দুরাও নিজেদের সভ্যতা-সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখাটা একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়েছে। তাদের বিশ্বাস, তাদের প্রিয় দেবতা দেবাদিদেব মহাদেব তাদের রক্ষা করবেন।

উনিশশো ষাটের দশকের শেষদিক থেকে সত্তরের দশকের শুরু পর্যন্ত সময়টায় যারা আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে ধ্বনি তুলেছিল— 'বন্দুকের নলই হলো ক্ষমতার উৎস', এবং 'তোমার নাম আমার নাম ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম,' তারা সম্ভবত জানত না যে ভিয়েতনামের সংস্কৃতিতে হিন্দুত্ব মিশে আছে যা মানুষকে মানুষ হিসাবে ভালবাসতে শেখায়, 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' যার বীজমন্ত্র। এ কথা সম্ভবত তারা জানত না যে ভিয়েতনামের এক বিরাট সংখ্যক মানুষ শিবলিঙ্গকে পরমপিতার প্রতীক হিসাবে পূজা করে। জানলে তারা হয়তো বলত না সোচ্চারে—

''ভুলতে পারি বাপের নাম,
ভুলবো নাকো ভিয়েতনাম।''

তথ্যসূত্র : Hinduism Today, April, May, June 2014।

রূপদহের রূপাই কালী

দেবপ্রসাদ মজুমদার

বৃহদ্‌বঙ্গ শাক্তভূমি, এখানে যখন আর্যদের পদার্পণ ঘটেনি, তখন থেকেই বৃহদ্‌বঙ্গ তথা রাঢ়বঙ্গে মাতৃ আরাধনা প্রচলিত ছিল। তার বহু প্রমাণ ও তথ্য পাওয়া যায়। দুর্গা শব্দ বেদে মাত্র দুটি স্থানে দৃষ্ট হয়। সেই হিসেবে পণ্ডিতরা দুর্গাদেবীকে বৈদিক দেবী হিসাবে প্রতিপন্ন করতে তৎপর। দুর্গার অপর নাম কাত্যায়নী। তিনি ঋষি কাত্যায়ন দ্বারা পূজিতা। এর দ্বারাও দেবী কাত্যায়নী বৈদিক দেবী হিসেবে প্রমাণিত। তৎসত্ত্বেও বলা যায় শ্রীচণ্ডী প্রথমে এই বঙ্গ ভূমিতে অনার্য শবর, ডোম, হাড়ি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের দ্বারাই সেবিত ও পূজিত হতেন। কালে কালে সেই দেবীর রূপ বৈচিত্র্যের যেমন অভিনবত্ব ঘটেছে তেমনি তাঁর নামেও। ভক্তের, সাধকের ভাবনায় ধ্যানে সেই অব্যক্ত, নিরাকারা, আদ্যাশক্তি যেভাবে প্রতিভাত হয়েছেন সেই ভাবেই তিনি রূপ গ্রহণ করে, সেই বিশেষ বিশেষ নামে পরিচিত্য হয়ে ভক্তের পূজা গ্রহণ করেছেন। ভারতবর্ষের উত্তর ভারতে যেমন শিব, পশ্চিম ভারতে গণেশ, দক্ষিণ ভারতে বিষ্ণুর প্রভাব, বৃহদ্‌বঙ্গে মা কালীরও সেইরূপ প্রভাব। তাই দেখা যায় যেখানেই বাঙালি সেখানেই কালী, রূপভেদ যাই থাকুক না কেন। আর একথাও সর্বজনগ্রাহ্য যে যত শক্তি সাধক বাংলায় আবির্ভূত হয়েছেন, ভারতভূমির অন্য প্রদেশে তার একান্তই অভাব। বহু সাধকের বহু সাধনার ধারায় পুষ্ট ও সমৃদ্ধ বাংলার শক্তি সাধনা ও কালীপূজা। বাংলাদেশেই সবচেয়ে বেশি কালী পূজা হয়ে থাকে। আর স্থায়ী কালীমন্দির তো অজস্র। তাই রূপবৈচিত্র্যেও তিনি অশেষ। এই প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ্য যে শুধুই কার্তিক মাসের অমাবস্যায় তিনি আরাধিতা বা পূজিতা হন, তা কিন্তু মোটেই নয়। সারা বছরের বিভিন্ন তিথিতে বিভিন্ন নামে ও মূর্তিতে তিনি আরাধিতা হন। দেবীর রূপ ও নাম বৈচিত্র্যে একজন হলেন রূপাই কালী। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর থানার রূপদহ গ্রামে প্রতি বছর বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের মঙ্গলবারে এই দেবীর পূজা প্রচলিত।

গ্রামের নাম রূপদহ। রূপাই বিলের পাশে অবস্থিত বলে গ্রামের নাম রূপদহ হয়েছে। এই রূপদহ সম্বন্ধে এক প্রাচীন কিংবদন্তী শোনা যায়। একসময় ওই রূপদহ গ্রামের অনতিদূরে সাহেবতলা গ্রামে কাটারি সাহেব নামে এক মুসলমান পিরের আস্তানা ছিল। তিনি ওই স্থানে সাধন ভজন করে সিদ্ধিলাভ করেন আর ওই খানেই দেহরক্ষা করেন। তাঁর মাজারে এখনো লোকসমাগম ও মেলা হয়। শোনা যায় ওই পিরের একটি সোনার ও একটি রুপার তৈরি বৃষ ছিল। কোনো কারণে ওই দুই বৃষের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে তাদের খুরের আঘাতে সাতটি দহের অর্থাৎ গভীর জলাশয়ের সৃষ্টি হয়। দহগুলো এখনো দেখা যায়। ওই দহগুলো কালীয়াদহ, বেলিয়াদহ, আমলাদহ, গোবিন্দদহ, রূপারদহ, পাথরদহ ও সোনাদহ। এই রূপার দহের পাশে বহু প্রাচীন হিজলী বৃক্ষের নীচে রূপাইকালীর অবস্থান এবং এখনো সেখানেই রূপাই কালী সেবিতা ও পূজিতা হচ্ছেন।

এখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে ওই দেবী কেমন? ওই রূপাই কালীর কোনও মূর্তি নেই।, একটি শিলাখণ্ডকে কালীজ্ঞানে পূজা করা হয়ে থাকে। কাহিনি ও কিংবদন্তী এই, যখন ওই গ্রামে বসতি শুরু হয় তখন গ্রামবাসীরা একদিন জঙ্গলের মধ্যে এক শিলাখণ্ড দেখতে পান। পরে ওই শিলাখণ্ডটিকে তাঁরা মাতৃজ্ঞানে পূজা করেন। দক্ষিণাকালী মন্ত্রে দেবী পূজিতা হয়ে থাকেন। সম্ভবত রূপদহ গ্রামের কালী বলেই রূপাই কালী নাম হয়েছে। প্রতি বছর বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষে খুব উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে এই রূপাইকালী ও তৎসহ গ্রাম্য কালীর পূজা হয়ে থাকে। ■

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

মুসলমান মহিলাদের জন্য সুবিচার প্রয়োজন

সুতপা বসাক ভড়

আজকের দিনে আমরা নারীসশক্তিকরণের কথা বলে চলেছি, অথচ বাস্তব অনেক নির্মম। দেশের অর্ধেক জনসংখ্যার সশক্তিকরণের জন্য আমরা সত্যিই কতটা আগ্রহী তার বিচার করবে কে? মুসলমান মহিলাদের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, তারা কীভাবে প্রতারিত হয়ে চলেছে, ধর্মের নামে তাদের স্বাধীনতা ও মতামতকে পিষে ফেলা হচ্ছে। ধর্মের সুবিচার কেবলমাত্র তাদের পুরুষদের প্রাপ্য, অপরদিকে কেবলমাত্র মহিলা হওয়ার জন্য তাদের নানাভাবে অত্যাচারিত হতে হয়, কিন্তু কেন?

কেন্দ্রীয় সরকার মুসলমান মহিলাদের অত্যাচার কম করার জন্য আগ্রহী। সেজন্য তৎকাল তিনতালাকের বিরুদ্ধে আইন করার জন্য প্রস্তাব লোকসভায় পাশ হয় গেছে। এখন এই প্রস্তাব নিয়ে রাজ্যসভায় আলোচনা করা হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় তিন তালাকের বিরুদ্ধে নির্ণায়ক সিদ্ধান্ত দেওয়ার সময় সরকারকে এই সম্বন্ধে আইন বানানোর ব্যাপারে নির্দেশ দেন। এদিকে তিনতালাকের বিরুদ্ধে আইন বানাবার আগেই তার সমালোচনা শুরু হয়ে গেছে। সাংবাদিক সাদিয়া দেহলবীর মতে তিন তালাক প্রথা ঠিক নয় এবং এর জন্য তিন বছরের শাস্তিও ঠিক নয়; এর ফলে মুসলমানদের কাছে ভুল বার্তা যাবে। অথচ মুসলমান মহিলাদের হিতার্থে কাজ করে চলেছে এমন কিছু সংগঠনের বক্তব্য কেবলমাত্র তিনতালাক নয়, নিকাহ হলালা, বহুবিবাহের বিরুদ্ধে এবং বাচ্চাদের দেখাশুনার জন্যও আইন বানানো অত্যাবশ্যক।

অপর একটি খবরে জানা গেছে যে, মহারাষ্ট্রে মহিলাদের অধিকারের জন্য কাজ করে চলেছে এমন কিছু সংগঠন এখনই তিন তালাককে অপরাধিক মামলা বানানোর জন্য এবং পুরুষদের বিরুদ্ধে তিনবছরের শাস্তির বিরুদ্ধে কংগ্রেস, সিপিএম এবং তৃণমূল সাংসদদের সঙ্গে আলোচনা করেছে। তাদের বক্তব্য তিন-তালাক প্রথাটি বন্ধ হওয়া উচিত, কিন্তু এর জন্য তিন বছরের কারাবাস ঠিক নয়।

বেবাক, জনবাদী মহিলা সমিতি ইত্যাদি কিছু সংগঠন উকিল ইন্দিরা জয়সিংহের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় পর্যন্ত যাওয়ার চেষ্টা করছে। সিপিএম সাংসদ মহম্মদ সেলিমের বক্তব্য, তার পার্টি সর্বদা তিন তালাকের বিরুদ্ধাচরণ করে এসেছে, কিন্তু এর বিরুদ্ধে আইন বানিয়ে কেন্দ্র সরকার সংখ্যালঘুদের নিশানা বানাচ্ছে। এদের এইসব বক্তব্য শুনে এই ভেবে আশ্চর্য বোধ হয় যে, এইসব তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, প্রগতিশীল ব্যক্তিদের সঙ্গে মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড এবং কট্টরপন্থীদের কী পার্থক্য? কারণ, মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডও তো মহিলাদের সুবিচারের প্রশ্ন উঠলে ধর্মের দোহাই দিয়ে সর্বদা পুরুষদের পক্ষে বক্তব্য রাখে।

একথা সত্য যে মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সিদ্ধান্তকে মুসলমানদের নিজস্ব ব্যাপার বলে বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল মেনে নেয়। শাহবানুর মামলাতেও এই ব্যাপার হয়েছিল, তবু সব বামপন্থী সংগঠন, জনবাদী মহিলা সমিতির মতো বেশ কিছু সংগঠন শাহবানুকে তাদের সমর্থন জানিয়েছিল। অথচ আজ পরিস্থিতি একদম পৃথক। এর কারণ কি শুধুমাত্র বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতা করা? যেহেতু এই সরকার মুসলমান মহিলাদের অধিকার হরণের বিরোধিতা করে তাদের সাহায্য করছে, সেজন্যই এ কেমন প্রগতিশীলতা, যেখানে কট্টরপন্থীদের অন্যায় দাবিগুলি প্রশ্রয় পাচ্ছে? এমন তো নয় যে কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতা করার জন্যই আজ নারীবাদী সংগঠনগুলি মহিলাদের হিতের থেকে পুরুষদের অন্যায় আবদারকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে?

মুসলমান মহিলাদের সুবিচার দিতে এত কুণ্ঠা কেন? সংখ্যালঘুদের রক্ষা এবং তাদের উপকার করা ভালো, কিন্তু তাই বলে তাদের সব কুকীর্তি, যা মহিলাদের প্রতি অবিচার করে চলেছে, তা দেখেও না দেখার ভান করা অন্যায়। তবু আশার কথা, কিছু সংগঠন এইসব তথাকথিত প্রগতিশীলদের অন্যায়-আবদার না মেনে কেন্দ্রীয় সরকারকে সমর্থন করছে। তারা এ ব্যাপারে কঠোর আইন বানাবার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করছে। দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মহিলারা নির্যাতিত, অত্যাচারিত হবেন—তা কখনোই কাম্য নয়। সুতরাং, তাদেরও সুবিচার পাওয়া উচিত। মহিলাদের প্রতি সুবিচারকেই প্রাথমিকতা দেওয়া উচিত, ধর্মের আড়ালে ভোটের রাজনীতিতে নয়।

চাষবাসের বারোমাস্যা : মাঘী কৃষি

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

বোরোধান : মাঘ মাসের প্রথম পক্ষ পর্যন্ত বোরোধান রোয়া চলবে। রোয়ার সময় জমিতে ছিপছিপে জল ধরে রাখতে হবে। পৌষ মাসে রোয়া ধানে এ মাসে দু'বার আগাছা দমন করতে হবে (রোয়ার ৩ ও ৬ সপ্তাহ পর) এবং মাঘ মাসে রোয়া ধানে প্রথম বারের জন্য জমি নিড়িয়ে আগাছা দমন করতে হবে মাসের শেষে। রাসায়নিক পদ্ধতিতেও আগাছা দমন করা যায়। চারা রোয়ার ৪ দিন পর বালি বা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে প্রাক-নির্গমন আগাছা নাশক যেমন বুটাক্লোর ৫০ শতাংশ বিঘা প্রতি ৪০০ গ্রাম হারে বা প্রোটিলাক্লোর বিঘাতে ১৩০ মিলি হারে ছড়িয়ে দিতে হবে। দ্বিতীয়বার আগাছা দমন করতে জমিতে ছিপছিপে জল ধরে রেখে বিঘাতে ৭০ লিটার জলে ২৫০ মিলি বিপাইরিভ্যাক সোডিয়াম গুলিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। দুবারই আগাছা দমনের পর জমিতে চাপান সার হিসাবে নাইট্রোজেন প্রয়োগ করতে হবে।

ফুল আসার আগে সপ্তাহে একবার রোগপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য মাঠ পরিদর্শন জরুরি। জমির এক কৌণিক বিন্দু থেকে অপর কৌণিক বিন্দু অবধি হাঁটলে রোগপোকার তীব্রতা অনুমান করা সম্ভব। তা বিবেচনা করেই জমিতে রাসায়নিক দমনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মাজরা পোকার ক্ষেত্রে শতকরা ৫টি মরা ডিগ বা পাশকাঠি দেখলে বা প্রতি বর্গ মিটারে ১টি ডিমের গাদা লক্ষ্য করলে কীটনাশক দিতে হবে। ঝলসা বা বাদামি ছিট্ রোগে আক্রান্ত ৫ শতাংশ পাশকাঠি দেখলে এবং খোলা-পচা রোগে শতকরা দুই থেকে পাঁচ শতাংশ আক্রান্ত পাশকাঠি দেখলে ছত্রাকনাশক ব্যবহার করতে হবে।

গম : সঠিক সময়ে বোনা গমে তৃতীয় (গাঁট বা থোড় আসার সময়, বোনার দু'মাস পরে) ও চতুর্থ দফার সেচ (ফুল আসার সময় অর্থাৎ বোনার আড়াই মাস পর) দরকার। এর মধ্যে চতুর্থ দফার সেচটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নাবিতে বোনা গমে দ্বিতীয় (অধিক পাশকাঠি বোরোনোর সময়, বোনার ৪০ দিন পর) ও তৃতীয় দফার সেচ দিতে হবে। অধিক নাবি গমে প্রথম (বোনার ২০-২২ দিন পর) ও দ্বিতীয় দফার সেচ দরকার। সঙ্গে প্রয়োজনমতো চাপান সার।

সরষে : এই মাস ফুলেল দশা। অ্যাপিড বা জাবপোকা দমনের জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। মাসের শেষ ভাগে টোরি সরষে কাটা শুরু হয়। টোরি ৭০-৮০ দিনের ফসল। খুব ঠাণ্ডা পড়লে সরষে পাকতে ও কাটতে সামান্য দেরি হয়। হলুদ সরষেও কাটা শুরু হবে মাঘ মাসের শেষ দিকে (বোনার তিন মাসাধিক কালে)।

আলু : সঠিক সময়ে লাগানো আলুতে এ মাসের প্রথমেই দ্বিতীয় দফায় গোড়ার মাটি তুলে ভেলি করে দিতে হবে। মাটি ধরানোর আগে দমন করতে হবে আগাছা।

মাঘের প্রথমে জাব পোকার সংখ্যা বাড়ে। এরা কুটে রোগ ছড়ায়, যা বীজ আলুর ক্ষতি করে। জাব পোকা দমন করতে ইমিডাক্লোপ্রিড ১৭.৮ এস.এল প্রতি ১০ লিটারে ৪ মিলি হারে অথবা অ্যাসিফেট কিংবা অ্যাসিটামিপ্রিড প্রতি লিটারে যথাক্রমে ০.৭৫ এবং ০.৪ গ্রাম পরিমাণ গুলে ছড়াতে হবে। স্বাভাবিক সময়ে লাগানো আলুতে (আলুর বয়স যখন ৬৫-৭০ দিন) কাটুই পোকা দমন করতে হবে। এরা নতুন আলুতে ছোটো ছোটো ছিদ্র করে দেয়। এই পোকা দমন করতে ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি প্রতি লিটার জলে ২.৫ মিলি হারে গুলে পাতায় ও আলুর ভেলিতে স্প্রে করতে হবে।

মাঘ মাসে প্রতি সপ্তাহেই আলুতে নাবি ধ্বসা রোগের জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। রোগটি পাতার কিনারায় বাদামি বা কালো দাগ দিয়ে শুরু হয়, তা বৃন্ত ও কাণ্ডতে ছড়ায়। দাগের

নিচে সাদা পাউডারের আস্তরণ চোখে পড়ে। রোগটি দমনের জন্য যেকোনও একটি বিধি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে—১। প্রতি লিটার জলে ডাইমিথোমর্ফ ৫০ ডব্লু.পি (১ গ্রাম) + ম্যানকোজেব ৭৫ ডব্লু.পি (২ গ্রাম); ২. প্রতি লিটার জলে সাইমক্সানিল ৮ শতাংশ + ম্যানকোজেব ৬৪ শতাংশ (ডব্লু.পি); ৩. প্রতি লিটার জলে ফেনামিডোল + ম্যানকোজেব।

চীনাবাদাম : মাঘ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে পুরো মাঘমাস জুড়ে বসন্ত-গ্রীষ্মকালীন চীনাবাদাম বোনা যাবে। খোসা ছাড়ানো বীজ লাগবে হেক্টরে ৯০-৯৫ কেজি, খোসাসমেত বীজ হেক্টরে ১২০-১৩০ কেজি। প্রতি কেজি বীজ শোধনের জন্য ২ গ্রাম ব্যাভিস্টিন অথবা ৩ গ্রাম ডাইতেন-এম-৪৫ (ম্যানকোজেব) লাগবে। জমি তৈরির জন্য হেক্টরে ২০ কেজি নাইট্রোজেন, ৬০-৭৫ কেজি ফসফেট এবং ৪০ কেজি পটাশ লাগবে। সমস্ত পরিমাণ সারই বীজ বোনার আগে জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। বীজের দূরত্ব হবে ২৫-৩০ □-১০ সেমি, গভীরতা ৪-৫ সেমি। বীজ বোনার দু'সপ্তাহের কিছু আগে প্রথম নিড়ানি দিতে হবে।

সবজি : গ্রীষ্মকালীন ফসলের জন্য মাঘ মাসে বীজতলায় লঙ্কার বীজ বোনা হবে। জমি বারবার চাষ দিয়ে, কুপিয়ে ঝুরু করে মিটার খানিক চওড়া ও পরিমিত লম্বা জমিখণ্ডে ১৫ সেমি উঁচু বীজতলা বানানো হয়। বীজতলায় প্রতি বর্গ মিটারে ৪ কেজি জৈবসার প্রয়োগ করতে হবে। বীজ বোনার আগে প্রতি লিটার জলে ২-৩ গ্রাম ক্যাপটান গুলে প্রয়োগ করে পলিথিন চাদর ঢাকা দিতে হবে। সাত দিন পর বীজ বুনতে হবে। ৫ সেমি গভীরে বীজ পোতা হয়, তা খড়-ঘাস দিয়ে চাপা দিতে হয়। দিতে হয় প্রয়োজনানুগ সেচ। দু সপ্তাহের মধ্যে চারা পাতলা করার কাজ শেষ করা দরকার।

মিষ্টিআলু : যে এলাকায় আমন ধান তুলে মিষ্টি আলুর লতা পৌষ মাসে বসানো হয়েছিল, তাতে মাঘ মাসে সারিতে মাটি তুলে দিতে হবে। তার আগে দিতে হবে চাপান সার, বিঘা প্রতি ১০ কেজি ইউরিয়া। মাটির ভেলি তোলার আগাছা দমনের কাজও হয়ে যায়। স্বাভাবিক লাগানো লতায় (আশ্বিন-কার্তিক) মাঘ মাসে বৃষ্টি না হলে বা জমিতে রসের পরিমাণ কমে গেলে এই মাসে একবার সেচ দিতে হবে।

মশলাপাতি : ধানের ফসল কাটা মাঘ মাসের শেষার্ধ থেকে চলবে চৈত্র পর্যন্ত। জিরে এবং মৌরির ফসলও কাটা শুরু হবে। নাবি-খারিফের পেঁয়াজ মাঘ মাস থেকে তুলতে হবে। পেঁয়াজ ব্যবহারযোগ্য আকার হলে, পাতার কিনারাগুলি বাদামি বর্ণ ধারণ করলে, ফর্ক বা কাটা খুরপি দিয়ে গর্ত খুঁড়ে পেয়াজ তুলতে হবে। মাটি ঝেড়ে নিয়ে ঠাণ্ডা, শুকনো এবং বায়ু-চলাচলকারী স্থানে মাটিতে বা তাকে কন্দগুলি মজুত করতে হবে।

ফল : মাঘ মাসের শেষ থেকে পেয়ারার শাখাপ্রশাখা ছাঁটাই করলে পরবর্তী শীতকালে উৎপাদন ও উৎকর্ষতা বাড়ানো যাবে। শাখার ৩০-৩৫ সেমি অগ্রভাগ সিকেটিয়ার দিয়ে ছাঁটা হলে তাতে বেশ কিছু নতুন শাখা বেরিয়ে আসে। আর তাতেই নতুন কুড়ি আসে।

কুলে এই সময় ফল পাড়া চলবে।

মাঘ মাস থেকে আম-বাগিচার সেচ দেওয়া শুরু হবে। এ মাসে আমের সরষে আকারের ফল হয় **(Mustard stage)**। এ মাসে মুকুল ধ্বসা **(Blossom Blight),**গুঁড়োচিতি রোগ **(Powdery Mildew)** এবং আমের শোষক পোকা দমনের জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। মুকুল আসার আগেই আমের শোষক পোকা দমন করতে হয়। তিন সপ্তাহ অন্তর তিন বার আলাদা কীটনাশক স্প্রে করা দরকার (থামোমিথোক্সাম @ ০.২৫ গ্রাম/লিটার; কার্বারিল @ ৪ গ্রাম/লিটার; মিথোমিল ৪০ এস.পি @ ১ গ্রাম/লিটার)। গুঁড়োচিতি রোগের জন্য ১৫ দিন অন্তর সালফেক্স গুঁড়ো (০.২%), ওয়েট্রাসাল (০.২%), থায়োভিট অথবা ব্যাভিস্টিন (০.১%), ক্যালিস্কিন (০.১%)-এর যেকোনও একটি প্রয়োগ করতে হবে। ব্যবস্থা নিতে হবে ক্ষতরোগ বা অ্যান্থ্রাকনোজ (পাতায় দাগ ও ফল পচা) দমনের জন্য। ফুল ফোটার আগে এজন্য স্প্রে করতে হবে ব্যাভিস্টিন ০.১% বা টপসিন-এম (মিথাইল থায়োফিনেট) ০.১% । পুনরুজ্জীবনের জন্য পৌষ মাসে কাটা গাছে মাঘের প্রতি পক্ষে সেচ দিতে হবে।

মাঘ মাসে ঝুনো নারকেলের বীজ সংগ্রহের কাজ শুরু হবে। গাছ থেকে নারকেল পেড়ে তা বাছাই করে নেওয়া দরকার। এ মাস থেকে নারকেলের পাতা খাওয়া পোকার আক্রমণ তীব্রতর হতে থাকে। ডাইক্লোরোভস ০.০২% পাতার তলায় স্প্রে করলে তা দমিত হয়। নারকেলের মাথা আটকে যাওয়া সমস্যা মোকাবিলায় এ মাসে মাটিতে গাছ প্রতি ৫০ গ্রাম বোরাক্স দিতে হবে। ■

শিশুর পেটে ব্যথা মানেই কৃমি নয়

ডা: শ্রীদীপ রায়

শিশুদের পেটে ব্যথা হলেই আমরা মনে করি কৃমি হয়েছে কিংবা খিদে লেগেছে। অথচ শিশুদেরও যে অ্যাসিডিটি হতে পারে, সেটা আমরা হয়তো চিন্তা করি না। গ্যাস্ট্রিক, পেপটিক আলসার বা অ্যাসিডিটি— যে নামেই ডাকি না কেন, শিশুদের মধ্যে এটি কিন্তু দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাচ্চাদের একটা বড় অংশ এইচ পাইলোরি নামের জীবাণুর প্রভাবে অ্যাসিডিটির সমস্যায় ভুগলেও বর্তমানে বাচ্চাদের ফাস্টফুড খাওয়ার প্রবণতাও এর মধ্যে অন্যতম বড় কারণ। এছাড়া স্কুল, বাড়ি থেকে বের হলেই শিশুরা বায়না ধরে ফুচকা, চটপটি, ভাজাভুজি প্রভৃতি খাওয়ার। এগুলো থেকেও অনেক সময় বাচ্চারা অ্যাসিডিতে ভোগে। অ্যাসিডিটির জন্য মানসিক চাপও অনেক অংশে দায়ী। কারণ, আজকাল শিশুদের সেভাবে কোনো বিনোদন নেই। আছে কেবল বইয়ের বিশাল বোঝা। স্কুলের পড়া, প্রাইভেট কোচিং আর পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য মা-বাবার চাপ। ফলে নিজেদের ওপর বিশ্বাস কমে যাচ্ছে। তার ওপর মানসিকভাবে চাপে থাকার কারণে তাদের অ্যাসিডিটিও বৃদ্ধি পাচ্ছে। অ্যাসিডিটি বেশি বেড়ে গেলে তা থেকে ক্রনিক অমাশা, পেপটিক আলসার সহ জটিল পেটের রোগ হতে পারে। তবে আগে থেকে লক্ষণগুলো জানা থাকলে এসব জটিলতা এড়ানো সম্ভব।

লক্ষণ—

পেটে ব্যথা, পেট ফাঁপা। ঢেকুর ওঠা। বমি বমি ভাব। অনিয়মিত মলত্যাগ। খিদে কমে যাওয়া।

আবার অনেক বাচ্চা এর কিছু বুঝতে পারে না। তারা কেবল পেট চেপে ধরে অস্থিরতা কিংবা কান্না করতে থাকে। সেদিকেও নজর দেওয়া প্রয়োজন।

প্রতিকার—

যেসব শিশুর অ্যাসিডিটির সমস্যা আছে, তাদের চটপটি, ফুচকা, ফাস্টফুড, কোল্ড ড্রিঙ্কস প্রভৃতি খাওয়া নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এইচ পাইলোরি থেকে বাঁচতে বিশুদ্ধ ও পরিষ্কার জল ও খাবার খাওয়াতে হবে। নিয়মিত খাবার আগে ও পরে সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করতে হবে। এটা অভিভাবক ও বাচ্চা উভয়কেই অভ্যাস করতে হবে।

চিকিৎসা— হোমিওপ্যাতি চিকিৎসা লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসা। লক্ষণ অনুযায়ী হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করলে এই রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। তবে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া উচিত নয়।

পরিশেষে, শিশুদের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিয়ম মেনে চললে রোগটি হবার সম্ভাবনা কমে যায়। তাই এই রোগ প্রতিরোধে মা-বাবা যত বেশি সতর্ক হবেন, ততই মঙ্গল। *(যোগাযোগ : ৯১৬৩২৬৮৬১৬)*

অন্য রকম

গরিব মানুষের ভরসা ওপরে ভগবান নীচে সুভাষিণী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সুভাষিণী মিস্ত্রি পদ্মশ্রী পুরস্কার পেয়েছেন। এই সাফল্যে তিনি নিজে যত না খুশি হয়েছেন তার থেকে বেশি তৃপ্তি পেয়েছেন সুভাষিণীর প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালের রোগীরা। এই সেদিনও তাঁরা শুধু ভগবানের ভরসায় বেঁচে থাকতেন। এখন ভগবানের দূত সুভাষিণী আছেন। একবার তার হাসপাতালে যেতে পারলে আর যাই হোক, বিনা চিকিৎসায় মরতে হবে না।

সত্তরের দশকের কথা। সুভাষিণী তখন থাকতেন কলকাতা থেকে মাত্র ২০ কিলোমিটার দূরে হাঁসপুকুরে। জায়গাটা তখনও প্রায় গ্রাম। সেখানেই সুভাষিণীর স্বামী গ্যাসট্রো এনটারটিসে ভুগে মারা যায়। পেশায় তিনি ছিলেন দিনমজুর। বলতে গেলে বিনা চিকিৎসাতেই তার মৃত্যু হয়। এর কিছুদিন পরেই কিছু একটা করার ভাবনা তার মাথায় আসে। স্বামীকে বাঁচাতে গিয়ে যে অবর্ণনীয় অভিজ্ঞতার সম্মুখীন তিনি হয়েছেন তা যাতে অন্য কারও ক্ষেত্রে না হয় তার জন্য তিনি দিন রাত এক করে ফেললেন। পরের কুড়ি বছরে তাঁকে বিচিত্র পেশায় দেখা গেছে। কখনও ঠিকে কাজের লোক, কখনও দিনমজুর আবার কখনও সবজিওয়ালি। ইতিমধ্যে সুভাষিণীর ছেলে অজয় মিস্ত্রি মায়ের প্রেরণা এবং কয়েকজন প্রতিবেশীর সহায়তায় ডাক্তারি পাশ করেছেন। সুভাষিণীর হাসপাতালের প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর তার ছেলের ডাক্তার হওয়া। এর পরের ধাপ হিউম্যানিটি ট্রাস্ট নামে ট্রাস্টগঠন এবং হাসপাতালের জন্য জমি কেনা।

তাঁর ভাগ্য ভালো ছেলে অজয় ছিলেন মেধাবী ছাত্র। কিন্তু শুধু মেধায় ভালো ছাত্র হওয়া যায়, ডাক্তার হওয়া যায় না। অথচ ছেলে ডাক্তার না হলে কে তার স্বপ্ন পূরণ করবে? সুতরাং টাকা চাই। ছেলের লেখাপড়ায় যাতে কোনও ব্যাঘাত না ঘটে, মা হয়েও তাকে পাঠিয়েছেন অনাথ আশ্রমে।

তারপর পার্কসার্কাসের চার নম্বর ব্রিজের কাছে সবজির দোকান দিলেন। রোজগার বাড়ল। মাসে ৫০০ টাকা। সেই প্রথম পোস্ট অফিসে অ্যাকাউন্ট খোলা হলো। ১ একর জমি। দশ হাজার টাকায়। গ্রামবাসীদের ডেকে বললেন তাঁর পরিকল্পনার কথা। তিনি জমি দেবেন কিন্তু গ্রামের সকলকে কিছু না কিছু আর্থিক সাহায্য করতে হবে। যাতে হাসপাতালের ছাউনিটুকু করা যায়। তাতেই আউটডোর বিভাগ চালু হয়ে যাবে। ৯২৬ টাকা উঠল। যাঁরা টাকা দিতে পারলেন না তাঁরা বাড়ি তৈরির নানা উপকরণ দিয়ে সাহায্য করলেন। তাও যাঁরা পারলেন না তাঁরা শ্রম দিলেন। ৪০০ বর্গ ফুট ছাউনি তৈরি হলো ১৯৯৩ সালে। তারপর শুরু হলো এক অন্যরকম লড়াই। অটো রিকশায় মাইক লাগিয়ে ১০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে প্রতিটি পাড়ায় মহল্লায় ঘুরে ঘুরে আবেদন জানানো হলো ডাক্তারদের কাছে। তাঁরা যেন সপ্তাহে অন্তত একদিন হাঁসপুকুরের হাসপাতালে (তখনও একটি টিনের শেড ভিন্ন হাসপাতালের আর কোনও সম্পত্তি নেই) এসে বিনা ফিজে গরিব রোগীদের চিকিৎসা করেন। বাড়ি-বাড়ি ঘুরে সংগ্রহ করা হলো ওষুধপত্র।

যে চিকিৎসক প্রথম এই মানবিক আবেদনে সাড়া দিয়েছিলেন তাঁর নাম রঘুপতি চট্টোপাধ্যায়। তারপর আরও পাঁচজন অত্যন্ত অল্প সময়ের ব্যবধানে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। এখন হাসপাতালে জেনারেল মেডিসিন, শিশুবিভাগ, অস্থিবিভাগ, চক্ষুবিভাগে একজন করে চিকিৎসক রয়েছেন। আর আছেন একজন হোমিওপ্যাথ। হাসপাতালের প্রথম দিনে ২৫২ জন রোগীর চিকিৎসা হয়েছিল। তারপর থেকে আর এই হাসপাতালকে পিছন ফিরে দেখতে হয়নি।

হাসপাতালের যাত্রা শুরুর প্রথম লগ্নেই সুভাষিণী একটি রূপরেখা ঠিক করে দিয়েছিলেন। এই হাসপাতালে কখনও ব্যবসার কথা ভাবা হবে না। গরিব রোগীরা নিখরচায় চিকিৎসা পাবেন। দারিদ্র্য সীমার ওপরে যারা বাস করেন তারা ১০ টাকা করে ফিজ দেবেন। হাসপাতালের অন্যতম ট্রাস্টি অজয় মিস্ত্রি মানেন হাসপাতালের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। তবুও তারা আদর্শচ্যুত হতে চান না।

সুভাষিণী সবজি বিক্রি করা ছেড়ে দিয়েছেন। বয়েস হয়েছে। হাঁটুতে আর তেমন জোর পান না। সারা জীবন অসাধ্য সাধন করেছেন। কিন্তু আত্মসুখের লেশমাত্র তাঁর চোখেমুখে খুঁজে পাওয়া যাবে না। জানতে চাইলে বলেন, 'এই হাসপাতাল যেদিন চব্বিশ ঘণ্টা চালু থাকবে সেদিন আমি সুখী হব। তার আগে নয়।'

হিউম্যানিটি হাসপাতালের রোগীরা প্রার্থনা করেন ঈশ্বর যেন সুভাষিণীর ইচ্ছে পূরণ করেন। কারণ যার টাকা নেই যে হৃদয়বান মানুষ খোঁজে। কংক্রিটের কলকাতা শহরে হৃদয় বড়ো দুর্লভ। সুভাষিণী মিস্ত্রির মতো বিলীয়মান প্রজাতির কিছু মানুষই তার হদিশ জানেন। ■

বিশ্ব তিরন্দাজিতে উঠে আসছে আমার ছাত্রী : রুমা রায়

রুমা রায়

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশের হয়ে দিল্লি, সিওল এশিয়াডে অংশ নিয়েছেন। অংশ নিয়েছেন আরও বহু আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায়। খেলা ছাড়ার পর সক্রিয় কোচিংয়ে এসে প্রতিভা তুলে আনার কাজটিও নিষ্ঠার সঙ্গে করে চলেছেন রুমা রায়। তিনি সাই পূর্বাঞ্চলের মুখ্য প্রশিক্ষক। এছাড়া বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের ডাকে ছুটে বেড়ান দেশের এপ্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে। তাঁর হাতে প্রশিক্ষণ পেয়ে সমৃদ্ধ হয়েছেন কল্যাণ আশ্রমের একাধিক তিরন্দাজ, যাঁরা পরে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। একান্ত আলাপচারিতায় উঠে এল নানা ঘটনাবহুল কোলাজ।

প্রশ্ন ঃ সামগ্রিকভাবে ভারতের ভবিষ্যত কতটা উজ্জ্বল?

রুমা ঃ এখন তো এশিয় ও বিশ্ব প্রতিযোগিতায় হামেশাই পোডিয়ামে দেখা যাচ্ছে ভারতীয়দের। দোলা ব্যানার্জি ২০০৯ সালে লন্ডনে বিশ্ব খেতাব জেতার পর চালচিত্র বদলে গেছে ভারতীয় তিরন্দাজির। দীপিকা কুমারী বিশ্ব ক্রমপর্যায়ে এক নম্বরে উঠে এসেছিলেন এক সময়ে। মালে সিংহ চাম্পিয়া, জয়ন্ত তালুকদার, বোম্বাইলা দেবী— প্রত্যেকেই আন্তর্জাতিক মঞ্চে ছাপ ফেলতে সক্ষম হয়েছেন। এখন ব্যক্তিগত স্তরে বিক্ষিপ্তভাবে ভারতীয়রা চমক দেখাচ্ছেন। এরপরে যুথবদ্ধভাবে সাফল্য ও গৌরবের যতিচিহ্ন আঁকতে হবে। আমি মনে করি, এবছরটা ভারতীয় তিরন্দাজির পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমে কমনওয়েলথ গেমস আছে, তারপর বছরের শেষদিকে এশিয়াড। ভারতের বেশ কিছু তিরন্দাজ এবার পদক গলায় ঝোলাবে। তবে চীন, দক্ষিণ কোরিয়ার পাশাপাশি থাইল্যান্ডের কড়া চ্যালেঞ্জ টপকাতে হবে। এরা ভারতের থেকে অনেক এগিয়ে।

প্রশ্ন ঃ ভারতীয়রা রিকার্ভে অতটা সফল হচ্ছে না কেন?

রুমা ঃ হ্যাঁ, এটা ঠিক। ভারতীয়রা যেরকম কম্পাউন্ড বিভাগে সাফল্য পায়, রিকার্ভে ততটা সাফল্য পাচ্ছে না। অভিষেক ভার্মা গত এশিয়াডে কম্পাউন্ডে সোনা জিতে যে গৌরবগাথা রচনা করতে পেরেছেন, তারপর রিকার্ভে ওরকম সাফল্য পাওয়াটা একান্ত আবশ্যক। দীপিকা, বোম্বাইলা প্রত্যেকেই আমার কোচিংয়ে ছিলেন, আশা করি ওরাও তুল্যমূল্য সাফল্য পাবে।

প্রশ্ন ঃ জাতীয়, আন্তর্জাতিক স্তরে আপনার পারফরমেন্স?

রুমা ঃ ১৯৮৫ সালে প্রথম জাতীয় গেমসে চাম্পিয়ান হই। এছাড়া ১৯৮১-৮৬ টানা সবক'টা মিটে এক নম্বরে ফিনিশ করেছি। তারই ফলশ্রুতি ১৯৮২, ৮৬ দিল্লি, সিওল এশিয়াডে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা। এছাড়া চারটি এশিয়ান তিরন্দাজি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছি। এই সময়ের মধ্যেই সর্বভারতীয় কোচিং কোর্স করে নিয়েছি সাফল্যের সঙ্গে। আমি ভারতীয় দলের কোচ হয়ে ২০০২ সালে চীনে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গ্রান্ড প্রিক্স প্রতিযোগিতায় গেছি। ২০১৫ সালে তুরস্কে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ তিরন্দাজি মিটেও ভারতীয় দলের কোচ ছিলাম। ওই মিটে দীপিকা ব্যক্তিগত ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন। আর গত আড়াই দশক ধরে সাইয়ের মুখ্য কোচ হিসেবে বহু ভারতীয় তিরন্দাজকে কাছ থেকে দেখেছি। কোচিং করিয়েছি বিশেষ পর্যায়ে।

প্রশ্ন ঃ তিরন্দাজিতে জনজাতিদের সম্ভাবনা কতখানি?

রুমা ঃ বিপুল সম্ভাবনার আধার। কল্যাণ আশ্রম যে ধরনের কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে দেশজুড়ে তার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। কল্যাণ আশ্রম বছরভর প্রশিক্ষণ দেয় জনজাতি তিরন্দাজদের। আর জনজাতি ছেলে-মেয়েদের জন্য যেসব রাজ্য ও জাতীয় প্রতিযোগিতা করে তার থেকে বহু প্রতিভাবান তিরন্দাজ উঠে আসে। এভাবে পাওয়া গেছে বিশ্বখ্যাত লিম্বারাম-সহ লালরেম সাংগা, পূর্ণিমা মাহাতোর মতো বহু তিরন্দাজকে। এখনও বহু উদীয়মান তিরন্দাজ দেশের নানা প্রান্তে সাই সেন্টারে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন, যারা পরবর্তীতে দেশের প্রতিনিধি হয়ে বিদেশের আসর মাতাবেন।

প্রশ্ন ঃ সরকারি স্তরে কী কী পুরস্কার, স্বীকৃতি পেয়েছেন?

রুমা ঃ রাজ্য সরকারের কাছ থেকে ২০১০ সালে সব খেলার কোচদের মধ্যে সেরা কোচের স্বীকৃতি পেয়েছিলাম। সবথেকে সেরা স্বীকৃতি বা পুরস্কার অবশ্যই সর্বভারতীয় তিরন্দাজি ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট বিজয় কুমার মালহোত্রর হাত থেকে কোচ হিসেবে বিশেষ সাম্মানিক পুরস্কার গ্রহণ করা। ওই স্বীকৃতিটা প্রায় দ্রোণাচার্য পুরস্কারের সমতুল্য। কারণ দিল্লিতে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে আরচারি অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ার তরফে প্রদান করা হয়েছিল। এই পুরস্কারের প্রতিদান ভারতীয় মহিলা তিরন্দাজদের কোচ রুমা রায় আন্তর্জাতিক মঞ্চে সুদে-আসলে ফিরিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। □

প্রথম মহিলা চিত্র সাংবাদিক

তোমরা যারা ইন্টারনেট ব্যবহার কর নিশ্চয় খেয়াল করেছ ২০১৭ সালে গুগল একজন নারীকে নিয়ে ডুডল ডিজাইন করেছিল, যার শিরোনাম ছিল 'ফার্স্ট লেডি অব দ্য লেন্স'। এই ফার্স্ট লেডি হলেন হোমাই ব্যারাওয়ালা। তিনি ভারতের প্রথম মহিলা চিত্র সাংবাদিক। তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন ভারতের স্বাধীনতা ও তার পরবর্তীকালের নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে লেন্সবন্দি করে। গান্ধীজীর মরদেহের যে ছবি আমরা সচরাচর দেখে থাকি সেটিও তুলেছেন হোমাই ব্যারাওয়ালা।

হোমাই ব্যারাওয়ালার জন্ম ১৯১৩ সালের ৯ ডিসেম্বর। গুজরাটের নাভসারির এক পার্সি পরিবারে। বাবা ছিলেন অভিনেতা। তিনি মেয়েকে কখনই তার পছন্দের কাজ করতে বাধা দেননি। হোমাই তাঁর জীবনের প্রথম ছবিটি তোলেন ১৩ বছর বয়সে। ছবি একটি শিল্প। তার জন্য দরকার শৈল্পিক দৃষ্টি। হোমাই ছবি তোলার এই শিল্প শেখেন স্যার জে জে স্কুল অব আর্টস্ থেকে। এছাড়াও সেই সময় 'লাইফ' ম্যাগাজিনে প্রকাশিত ছবিগুলি তিনি দেখতেন। সেখানে প্রকাশিত আধুনিক আলোকচিত্র বা মর্ডানিস্ট ফোটোগ্রাফ তাকে আকর্ষণ করত। তারপর বম্বে ক্রনিক্যাল, ইলাস্ট্রেটেড উইকলিতে ছাপা হতে থাকে তাঁর তোলা নানা ছবি।

১৯৪২ সালে হোমাই যোগ দেন ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসে। তাঁর সামনে খুলে যায় এক নতুন দিগন্ত। সেই সময় তাঁর ক্যামেরায় বন্দি হয় বহু গুরুত্বপূর্ণ ছবি। দেশ বিভাগের পক্ষে কংগ্রেস নেতাদের ভোটদান, সদ্য স্বাধীন হওয়া ভারতের একটু একটু করে গড়ে ওঠার নানা চিত্র। মার্টিন লুথার, মার্শাল টিটো, জুনিয়র হো চি মিন, ক্রুশ্চেভ প্রমুখ ব্যক্তিত্ব যাঁরা তখন ভারতে এসেছিলেন তাঁদেরও ছবি তোলেন হোমাই। ১৯৫৬ সালে ভারতে পা রাখেন তরুণ দলাই লামা, তাঁর ছবিও ক্যামেরাবন্দি করেন হোমাই। ধীরে ধীরে তিনি একজন চিত্র সাংবাদিক হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে থাকেন।

সে সময় অনলুকার, কারেন্ট-এর মতো বিখ্যাত ম্যাগাজিন হোমাইকে অনুরোধ করে তাদের ম্যাগাজিনের জন্য ছবি তুলতে। ছবি তোলার সময় হোমাইয়ের পছন্দের পোশাক ছিল শাড়ি। তখনকার দিনের আধুনিক মহিলারা নানা পোশাক পরলেও হোমাইয়ের পছন্দের ছিল শাড়ি। সে কারণে তাঁর ডাকনাম হয়ে যায় মাস্মি। স্বামী মানেকশ ছিলেন হোমাইয়ের ছবি তোলার অনুপ্রেরণা। কিন্তু ১৯৭০ সালে স্বামীর মৃত্যুতে হোমাইয়ের জীবন থমকে যায়। তিনি তাল মেলাতে পারছিলেন না হলুদ সাংবাদিকতার সঙ্গে। ছবি তোলা ছেড়ে দেন ভারতের প্রথম মহিলা ফোটোগ্রাফার। ২০১২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ৯৮ বছর বয়সে তাঁর জীবনদীপ নিভে যায়। ২০১১ সালে তিনি পদ্মবিভূষণ সম্মানে ভূষিত হন।

ভারতের পথে পথে

কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যান

ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যে স্থান করে নিয়েছে অসমের জাতীয় উদ্যান। বহু প্রজাতির বন্য প্রাণী এখানে দেখা যায়। বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ একশৃঙ্গ গণ্ডারের বাস এখানে। এ ছাড়াও বাঘ, হাতি বন্যমহিষ, সম্বর হরিণ ও চিতা বাঘের আবাস এই কাজিরাঙা। এখানে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি সংরক্ষণ করা হয়। তাই বার্ড লাইফ ইন্টারন্যাশনাল কাজিরাঙাকে গুরুত্বপূর্ণ পক্ষীক্ষেত্র হিসেবে ঘোষণা করেছে। ব্রহ্মপুত্র নদ-সহ চারটি নদী এখান দিয়ে বয়ে চলেছে। কাজিরাঙাকে সংরক্ষিত বনভূমি হিসেবে ঘোষণা করা হয় ১৯০৫ সালে। ২০০৫ সালে এর শতবর্ষ উদ্‌যাপিত হয়। এখানে পর্যটকদের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে।

জানো কি?

পৃথিবীর দীর্ঘতম রেলওয়ে টানেল

১) সুইজারল্যান্ডের গটহার্ড টানেল ৫৭ কিলোমিটার

তারপর

□ জাপানের সিকান টানেল ৫৩.৯ কিলোমিটার

□ দক্ষিণ কোরিয়ার ইয়ুলহিয়োন ৫০.৩ কিলোমিটার

□ সুইজারল্যান্ডের লোতয়াবার্গ বেস টানেল ৩৪.৫ কিলোমিটার

□ চীনের নিউ গুয়ানজিয়ায়ো ৩২.৬৪৫ কিলোমিটার

□ স্পেনের গোয়াদররামা ২৮.৪ কিলোমিটার

এছাড়া, ইংলিশ চ্যানেল ৫০.৫ কিলোমিটার

ভালো কথা

ভালো কাজ

আমি প্রতি বছর শীতের সময় কলকাতা যাই। সারাদিন চিড়িয়াখানা, জাদুঘর, তারামণ্ডল দেখে সন্ধ্যায় কাকুর সঙ্গে হাওড়া থেকে ট্রেনে চন্দননগর ফিরছিলাম। উত্তরপাড়া ছাড়তেই কামরার ওপ্রান্তে চিৎকার শুনে কাকু ছুটে গিয়ে দেখে এক বয়স্ক ব্যক্তি অজ্ঞান হয়ে গেছেন। তাঁর সঙ্গে বাড়ির কেউ নেই। সবাই বললো পরের স্টেশনে নামিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। কাকু বললেন চল আমরাই ডাক্তারখানা নিয়ে যাই। কাকু পাঁজাকোলা করে তাঁকে নামালেন। তারপর ছুটে গিয়ে রেলপুলিশকে কী যেন বললেন। তারাও ছুটে রোগীর কাছে এলেন। ফোনে অ্যাম্বুলেন্স ডাকলেন। অ্যাম্বুলেন্স এলে আমরা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করালাম। একটু পরে তাঁর জ্ঞান ফিরল। কাকু তাঁর সঙ্গে কথা বলে ফোনে তাঁর বাড়িতে সব জানিয়ে দিলেন। আধঘণ্টা পর তাঁর বাড়ির লোকেরা এলে তাঁদের সব বুঝিয়ে দিয়ে আমরা ট্রেন ধরলাম। সেদিন বাড়ি পৌঁছতে আমাদের অনেক রাত হয়েছিল। কাকু বললেন এরকম কাজ সভ্য দেশের সবাই করে থাকে। আমাদের দেশের বেশিরভাগ লোক শুধু নিজের কথা ভাবে। এরকম কাজ করতে পেরে সেদিন আমার খুব ভালো লেগেছিল। **অমিত চৌধুরী,** অষ্টম শ্রেণী, চন্দননগর, হুগলী।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
১) লা ব্যা শা য়া	১) ভো মো গ হ ন
২) তা ভা বি গ্য	২) না যো সা গ ধ

২২ জানুয়ারি সংখ্যার উত্তর

১) অতিবেগুনি ২) আক্কেলদাঁত

২২ জানুয়ারি সংখ্যার উত্তর

১) ইজিচেয়ার ২) ঈশ্বরচন্দ্র

উত্তরদাতার নাম

১) শঙ্খশুভ্র দাশ, সোনারপুর, দঃ ২৪ পরগনা। ২) সৌরিন কেশ, তুলসীডাঙ্গা, বর্ধমান। ৩) প্রণয় চক্রবর্তী, বালুরঘাট, দঃ দিনাজপুর। ৪) ঐশী মুখার্জী, ছাতনা, বাঁকুড়া।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

শোকসংবাদ

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের হুগলী জেলার উত্তরপাড়া শাখার দীর্ঘদিনের কর্মী অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় গত ৪ জানুয়ারি পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তাঁর স্ত্রী ও মেয়ে বর্তমান। কলকাতায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কাজ করার সময় বি বা দী বাগ অফিস পাড়ার কর্মীদের সংগঠিত করার কাজে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশোনা করতে ভালবাসতেন। বস্তুত তিনি বাড়িতে একটি ছোটখাট লাইব্রেরিও তৈরি করেছিলেন। লেখালিখিও করতেন। তাঁর রচিত পুস্তক— যিশুখ্রিস্টের জীবনের এক অজ্ঞাত অধ্যায় (১ম ও ২য় খণ্ড), তিব্বতে যোগী ও তান্ত্রিকদের সান্নিধ্যে (১ম খণ্ড)। তাঁর সম্পাদিত পুস্তিকার নাম— সাম্প্রদায়িক কে? বাণী ও ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

* * *

কলকাতা উত্তর বিধাননগর বিজেপির মণ্ডল সভাপতি প্রভাকর মণ্ডলের মাতৃদেবী কুব্জা মণ্ডল তাঁর মহিষবাথানের বাড়িতে গত ৩১ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তিনি স্বামী, ৪ পুত্র ও ১ কন্যা রেখে গেছেন।

* * *

মালদা জেলার গাজোলের স্বয়ংসেবক বর্তমানে বিজেপির গাজোল মণ্ডলের সভাপতি চঞ্চল প্রসাদ চক্রবর্তীর সহধর্মিণী ও সংস্কার ভারতী গাজোল শাখার সভানেত্রী শ্রীমতী জয়া চক্রবর্তীর মাতৃদেবী ঝরনা চক্রবর্তী গত ১৯ ডিসেম্বর পরলোগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। উল্লেখ্য, প্রয়াত ঝরনা চক্রবর্তী একজন সুগায়িকা ও সমাজ সেবিকা হিসেবে পরিচিতা ছিলেন।

শ্রীমতী জয়া চক্রবর্তীর পিতৃদেব অনিলবরণ চক্রবর্তী গত ৯ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। কর্মজীবনে তিনি সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন। তিনি ১ পুত্র, ১ কন্যা ও জামাতা, নাতনি এবং অসংখ্য গুণমুগ্ধ সঙ্গীতানুরাগী ব্যক্তি রেখে গেছেন।

* * *

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুর শাখার স্বয়ংসেবক দেবোপম চট্টোপাধ্যায়ের মাতৃদেবী তথা প্রয়াত পূর্বতন জেলা সঙ্ঘচালক দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী অনিমা চট্টোপাধ্যায় গত ১৪ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। তিনি ১ পুত্র, পুত্রবধূ, ২ কন্যা, জামাতা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তাঁর বাড়িতে স্বয়ংসেবকদের যাতায়াত ছিল অবাধ। সকলেই তাঁর স্নেহলাভ করেছেন।

* * *

কলকাতার প্রবীণ স্বয়ংসেবক প্রখ্যাত সিএ পতঞ্জলি শর্মা গত ২৯ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তিনি ১ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তিনি ভাগকার্যবাহ ও কলকাতা মহানগরের শারীরিক প্রমুখের দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছেন। তাঁর পিতাও কলকাতা মহানগরের স্বয়ংসেবক ছিলেন।

* * *

মালদা নগরের সাভারকর শাখার পূর্বতন কার্যবাহ সুদীপ ঠাকুরের পিতৃদেব স্বপন ঠাকুর গত ৪ জানুয়ারি মানিকচক থানার খানপুরের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তিনি ১ কন্যা, ১ পুত্র ও নাতি-নাতনি রেখে গেছেন।

* * *

বাঁকুড়া জেলার খাতড়া মহকুমার মণ্ডলকুলি শাখার স্বয়ংসেবক অরবিন্দ পাত্র গত ২৪ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তিনি স্ত্রী, ১ দাদা, ১ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনি রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তিনি প্রয়াত প্রচারক সুকুমার পাত্রের অনুজ।

* * *

কলকাতা পূর্ব বিভাগের দশদ্রোণ শাখার স্বয়ংসেবক তথা স্বস্তিকা পত্রিকার একনিষ্ঠ কর্মী মন্টু দাসের মাতৃদেবী রেখারানি দাস গত ২৭ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি তিন পুত্র, তিন পুত্রবধূ, তিন কন্যা, তিন জামাতা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

শ্রদ্ধানিধি

গত ২৮ ডিসেম্বর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ব্যারাকপুর জেলা কার্যবাহ মদন বিশ্বাসের মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে তিনি ও তাঁর সহধর্মিণী শিখা বিশ্বাস বেশ কয়েকজন দুঃস্থ ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণভোজে আপ্যায়িত করে তাঁদের হাতে কম্বল তুলে দেন। অনুষ্ঠানে তাঁর আত্মীয়স্বজন এবং সঙ্ঘের সহপ্রান্ত প্রচারক শ্যামাচরণ রায়-সহ বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

মঙ্গলনিধি

গত ৯ ডিসেম্বর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সেবা প্রমুখ মনোজ চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা তনিমা চট্টোপাধ্যায়ের শুভ বিবাহ উপলক্ষে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন দুর্গাপুর নগর সঙ্ঘচালক অশোক বোরারের হাতে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজ সেবা ভারতীর প্রাদেশিক সভাপতি খড়্গপুর আইআইটি-র অধ্যাপক ভি.কে তেওয়ারি, প্রান্ত সহসেবা প্রমুখ ধনঞ্জয় ঘোষ, জম্মু-কাশ্মীর-লাদাখ রাজ্যের সেবা প্রমুখ জয়দেব সিংহরায়, আসানসোল জেলা সঙ্ঘচালক নিরঞ্জন মাকুড়-সহ বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জেলা কার্যবাহ অচ্যুত হাজরা।

* * *

গত ১৩ ডিসেম্বর বর্ধমান জেলার পূর্বতন জেলা কার্যবাহ তুষার হাজরা তাঁর কন্যা দীপান্বিতার শুভ বিবাহের অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন বিভাগ সেবা প্রমুখ সুব্রত সামন্ত'র হাতে। অনুষ্ঠানে প্রান্ত কুটুম্ব প্রবোধন প্রমুখ অমরকৃষ্ণ ভদ্র, বিভাগ কার্যবাহ প্রদীপ চৌধুরী-সহ বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. KOL RMS/048/2016-18
5 February - 2018 - Rs. 10.00

Published and Printed by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6.
Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. ।। দাম ১০ টাকা ।।